KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 7/3 7/4 8/1 8/2	Year of Publication : Aug 1984 July - Sep 1984 Feb 1985 April 1985
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

২৮

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্প্রতি প্রকাশিত / পুনর্মুদ্রিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাপছাড়া

'সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'

ছড়া-জাতীয় নানা ছন্দে রচিত সরস কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য—কতকগুলি কবিতার রস ছোটো ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি সম্ভোগ করতে না পারলেও সেগুলির ধ্বনি তাদেরও আনন্দ দেবে। প্রতিটি কবিতার সঙ্গে কবি-অঙ্কিত শতাধিক স্কেচ এবং রঙিন চিত্র। মূল্য ৫০·৭০ টাকা।

প্রহাসিনী

জীবনটা যখন (১৩৪৫) কখনো গভীর অধ্যাত্ম ভাবে সমাহিত কিম্বা বিদায়ের করুণ রসে সিক্ত তখনই "মাঝে মাঝে এসে পড়ে খাপা ধূমকেতু।" তারপর "ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা করি নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।"

প্রহাসিনীর কবিতাগুলি সেই নির্মল কৌতুকের বিদ্যুচ্ছটায় উদ্ভাসিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ভিন্ন রসের কবিতা সংকলন। মূল্য ১৬·০০ টাকা।

ভগ্নহৃদয়

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত শতবর্ষ-পূর্বে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে, অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপি-চিত্র-সংবলিত। মূল্য ২৫·০০ টাকা।

সংগীতচিন্তা

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ

সংগীতবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সমস্ত রচনার সংকলন। সংগীত বিষয়ক প্রথম প্রকাশিত দুটি রচনা পরবর্তীকালে সংশোধন ও সংযোজন করেন রবীন্দ্রনাথ—'সংগীতচিন্তায়' নতুন সংস্করণের প্রথম প্রবন্ধ রূপে সেটি মুদ্রিত। এছাড়া গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা পত্রালোচনা গ্রন্থ-সমালোচনা এবং কোনো কোনো প্রবন্ধের অংশবিশেষও নতুন সংযোজিত। পরিশিষ্টে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ এই সংস্করণের অঙ্গীভূত হল। পাণ্ডুলিপি এবং আলোকচিত্র শোভিত শোভন সংস্করণ। মূল্য ২৫·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
গ্রীষ্ম ১৩৯২

সূচীপত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

সম্পাদকীয়
সন্তোষকুমার ঘোষ প্রসঙ্গে ॥ মুকুল গুহ

প্রবন্ধ
রহস্যময় প্রাচ্যবিদ্ ॥ নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৯
বিপ্লব আন্দোলনের শেষ অধ্যায় : একটি আলোচনা ॥
লাডলীমোহন রায়চৌধুরী ৮৫

কবিতা গুচ্ছ
উৎপলকুমার বসুর কবিতা ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২৫
জয় গোস্বামীর কবিতা ॥ মল্লিনাথ গুপ্ত ২৯

পুনর্বিবেচনা
শেষের হেলিয়োট্রোপ মণীন্দ্রলাল ॥ শর্মিলা বসু ৩৫

বিশেষ ক্রোড়পত্র
হোল্ডারলীনের জীবন ও রচনার রূপরেখা
নিয়তি ও দেবযান ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার প্রদীপ দাশগুপ্ত

শুভকুমার বসু

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস | কলকাতা-১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, রমাপ্রসাদ রায় লেন এবং করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় বাজেটে মুদ্রণ ও লেখার কাগজের ওপর অস্বাভাবিক কর চাপানো হয়েছে। এই অপরিণামদর্শী করের গুরুভার সাহিত্য পত্রিকা ও প্রকাশনা জগতে কি তুমুল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে লিটল ম্যাগাজিনগুলি, ভাল লেখা:প্রকাশের আন্তরিক প্রয়াস ছাড়া যাদের আর এমন কিছুই নেই যাতে এই কর-ধাপ্পার ধাক্কা সামলানো যাবে। ধাপ্পা শব্দটির ব্যবহার মনস্কভাবেই করা হলো। কেন না যে দেশে অক্ষর-জ্ঞানীর সংখ্যা এখনো করুণ, যেখানে ব্যাপক অর্থে প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা অনুল্লেখ্য, সেখানে কাগজের এমন শিহরণ-সঞ্চারী কর-বৃদ্ধি সব অর্থেই গণতন্ত্রবিরোধী।

ভারত এখনো নিদারুণ ভাবে অসম বিত্তবন্টনের দেশ। কেন্দ্রীয় বাজেটে যে সব ছাড় লক্ষ্য করা গেছে তাতে উচ্চবিত্ত ও ব্যবসায়ীদের সুবিধে হবে, যাদের কাগজের দাম বাড়লে তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু মুস্কিল হলো, এখনো নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই সৎ-সাহিত্য পঠন এবং গ্রন্থ বা সাহিত্যপত্র ক্রয়ের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। গত দেড় বছরে কাগজের দাম প্রায় ৭০ শতাংশ বেড়েছে। নতুন করের কারণে আরো বাড়বে। বাড়াতে হবে কাগজে মুদ্রিত সবকিছুরই মূল্য। ফলে বহু কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র বিক্রীর ওপরে কাগজ চালাতে হলে কাগজের দাম প্রতি কপি তিনগুণ বাড়িয়েও তল পাওয়া যাবে না। সত্যিকারের যোগ্য কাগজ দাবী করে পাঠকের সাগ্রহ-সংগ্রহ ও উপযুক্ত সংরক্ষণ, নিউজপ্রিন্টে ছাপা হলে যা অসম্ভব। তাছাড়া সরকার ম্যাপলিথো বা ভাল হোয়াইট প্রিন্টের কোনো কোটা দেন না ছোট কাগজগুলিকে। অথচ এই উল্লেখিত মানের কাগজ কখনোই মিল-নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজারে বিক্রী হয় না। কালোবাজারী মূল্যেই সাদা কাগজ কিনতে হয়।

দিল্লা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুদূর। একক বা মাত্র কয়েকজনের কণ্ঠ রাজধানীর স্বেচ্ছাবধির কর্তাব্যক্তিদের কানে পৌছুবে না, চাই সমস্ত বাঙালী সাহিত্যানুরাগী, লেখক, সম্পাদক, প্রকাশকদের যৌথ প্রতিবাদ। পশ্চিমবাংলার মতো ভারতে

আর কোথাও এত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না। মানের নিরেখে হয়তো এর সিংহভাগই তেমন কোনো সাহিত্য উদ্দেশ্য সাধন করে না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের অন্যতম দর্পণ এই পত্রিকাগুলি। যুব মানসিকতার বিচ্ছুরণ ও বিস্ফোরণ প্রবণতা, সবই লক্ষ্য করা যায় এই লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে। সেই অর্থে এদের একটা দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা থেকেই যায়। সুতরাং এই করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবিলম্বে সুরু হওয়া প্রয়োজন।

নানা নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য কারণে "দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার" অনুষ্ঠানটি গত বছর স্থগিত ছিল। এবছর জুন মাসের কোন এক সময়ে তা অনুষ্ঠিত হবে। যথা সময়ে কাগজে তা বিজ্ঞাপিত হবে।

সুলেখক ও প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের পরলোক গমনে আমরা গভীর শোকাহত। কবি দিনেশ দাশও আর আমাদের মধ্যে নেই। এই দুজনই আমাদের অতি কাছের মানুষ ছিলেন।

ভারত-জার্মান সংস্কৃতি-বন্ধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'গ্যয়টে' পুরস্কার পেয়েছেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এ বছরের আনন্দ পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। তাকে বিভাবের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষ বিভাবের সমস্ত পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা শুভানুধ্যায়ীকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিভাবের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সন্তোষকুমার ঘোষ প্রসঙ্গে মুকুল গুহ'র সংযোজন

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সন্তোষকুমার ঘোষই ছিলেন আক্ষরিক অর্থে, বিতর্কিত পুরুষ। বিতর্কিত এই কারণে নয় যে তিনি তথাকথিত কোন অসামাজিক জীবন যাপন করেছেন, সে কারণেও নয় যে, তিনি এমন কিছু রচনা করেছেন যা প্রকৃত অর্থে বৈপ্লবিক। তিনি বিতর্কিত পুরুষ হয়েছিলেন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যকে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত কার্যে রূপান্তরিত করেছিলেন বলে। সাদামাটাভাবে সেটাই ছিল বোধহয় প্রয়াত

সন্তোষকুমার ঘোষকে নিয়ে বিতর্কের মূল কারণ। সেই যে বিতর্কের সূত্রপাত তিনি ঘটিয়ে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ধারায় সেই বিতর্ক প্রবহমান থাকবেই। অন্তত আরও বেশ কিছুকাল। তাঁর সম্মানিত প্রয়াণের পরও তা থেমে থাকছে না। আর সেখানেই সম্ভবত খুঁজতে চাইছেন অনেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রজ্জ্বল ফাসাড। কিন্তু লেখক হিসেবেও। শুধুমাত্র লেখক হিসেবেও তাঁকে নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারত। সাংবাদিকতায় সাহিত্য কতটা জরুরী বা সাহিত্যে সাংবাদিকতা, এ আলোচনা গবেষকরা করবেন। আমি তাঁর ঐ ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের অলঙ্কারে কতটা অলঙ্কৃত ছিল সেই ধৃষ্টতায় বরং ব্যাপৃত হতে চাই।

প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন এই আলোচনার, সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যও রচনা করেছেন। ৬৫ বছরের জীবনে ৭টি উপন্যাস ও অসংখ্য ছোটগল্প ও প্রবন্ধের অনলস রচনা তিনি করেছেন, কিন্তু অসাড়ে নয়। প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট, যা অবহেলা করা বা লক্ষ্য না করা, অসম্ভব। 'ভগ্নাংশ' পর্যায়ের গল্প, 'কিছু গোয়ালার গলি' বা 'নানা রঙের দিন' উপন্যাস আজ ৩৬ বছর আগে বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যে আলোড়ন তুলেছিল সে আলোড়নের পিছনে ছিল না কোন সাংবাদিকতার ঢেউ। সেই আলোড়নের সব কৃতিত্ব তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার বাস্তব ফলশ্রুতি। কিন্তু পরবর্তী কালে? আমরা বারংবার শুনেছি 'সাংবাদিক সন্তোষকুমার লেখক সন্তোষকুমারকে অবহেলা করছেন'। ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযোগ আমি কখনও তাঁকে করতে পারিনি। তার কারণ আমার মনে হয়েছিল সেটা তিনি করেননি। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমাগত লেখার যে চল এখন বর্তমান সেই হিসেবে অবশ্যই তিনি তুলনামূলকভাবে কম লিখেছেন। কিন্তু তার জন্য অন্য কোন দ্বিতীয় কারণ খুঁজতে যাওয়া কি খুবই জরুরী? হয়ত তিনি বারবার ভাষার ফর্ম ভাঙতে চাইছিলেন। লেখার ফর্ম, বক্তব্যের ফর্ম। সেইসব পরীক্ষা নিরীক্ষাই হয়ত তাঁকে বেশি লিখতে দেয় নি! কারণ আমরা জানি, এবং কে না জানে যে, তাঁর ছিল সর্বগ্রাসী ক্রতপঠন। এবং তাঁর দেখার চোখ ছিল। অগ্রজ ও অনুজদের সঙ্গে ব্যবহারের দরজা তিনি খুলে রাখতে জানতেন। গ্রহণ ক্ষমতা ছিল ঈর্ষণীয়। অতি বড় শত্রুও তাঁকে 'অলস ছিলেন' এ আখ্যায় ভূষিত করতে দ্বিধা করবেন। তাহলে?

দ্বিতীয় অবলম্বন তাঁর ব্যবহার। যাঁরাই তাঁর কাছে এসেছেন। জানেন যে

কেমন শিশুর মতন ছিল ওই উজ্জ্বল হিমালয়ের মানসিকতা। তাঁর অভিমান ছিল, অহংকারও ছিল, কিন্তু তাঁর সবটাই ছিল গঠনমূলক। আমার মাঝে মাঝে মনে হত। তিনি যে ওই ছোট্ট ছুটো হাত বাড়িয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছু আঁকড়ে ধরতে চান। 'আলিঙ্গন' ছিল কি তাই তাঁর প্রিয় শব্দ।

আর তৃতীয় অবলম্বন তাঁর গতি। এত দ্রুত গতিশীল ও চলমান লেখক কজনই বা আছেন? তাঁর সুযোগ ছিল, ক্ষমতা ত ছিলই, সাম্প্রতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার। কিন্তু তা তিনি দেন নি। থমকে দাঁড়িয়ে যেন আরও দ্রুত উজানে ঠেলেছিলেন নিজেকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সরলতর হওয়ার পরিবর্তে তাঁর রচনা এমন কি জীবনযাপন, ব্যবহারও হয়ে যাচ্ছিল জটিলতর। দ্রুত এক ভয়ংকর জটিলতর সময়ের অভিনিবেশে নিজেকে দেখে তিনি কি চমকে উঠতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সন্তোষকুমারের ত কখনই অসুবিধা হয় নি সত্তরের দশকের এমন কি আশির দশকের কোন কবির কবিতার তারিফ করতে, কিংবা সমালোচনায় নস্যাৎ করতে। বিংশ শতাব্দীর শেষ কালে যখন সমস্ত পৃথিবীই ছুটে চলেছে, তখন সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই তিনি ছুটতে চেয়েছিলেন। অবসন্ন হয়ে থেমে যান নি।

এই রকম একটি অস্থির মানসিকতাকে আমাদের বুঝতে যে অসুবিধা হবে সেটাই ত স্বাভাবিক। সেই পুরোন ভাষায় বলা যায় যে 'সন্তোষকুমার বোঝেন নি সন্তোষকুমারকে'। একবিংশ শতাব্দীর দরজায় এরকম একটা অবস্থা অত্যন্ত বাস্তব বলে প্রতীয়মান মনে হচ্ছে না কি?

এই দীর্ঘ ৬৫ বছর আপাতদৃষ্টিতে বেশি সঙ্গে আপ্লুত মনে হলেও লেখকের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার আক্রমণ তাঁকে আহত করত। তাই কখনও কবিতায়, কখনও সঙ্গীতে, কখনও বা নিরলস আড্ডায় ছিল তাঁর চারিত্রিক স্ফূর্তি। সব মিলিয়ে এ কথাই মনে হয় যেন বিপ্লব ছিল তাঁর স্বভাবজ। কোন বৈপ্লবিক সাহিত্যসৃষ্টি তিনি করেছেন কি করেন নি, সে প্রশ্নের বিচার করবেন অবশ্যই পাঠকরা। কিন্তু বৈপ্লবিক জীবন যে তিনি যাপন করেছেন সে প্রশ্নে কোন সন্দেহই নেই। এই অষাঢ় গড্ডালিকা প্রবাহে সচেতন এমন মানুষ খুব কি বেশি থাকে কোনদিনই? আমার ত সব শ্রদ্ধা-ভালবাসার বাইরেও তাঁকে ঈর্ষা শুধু সেই কারণেই।

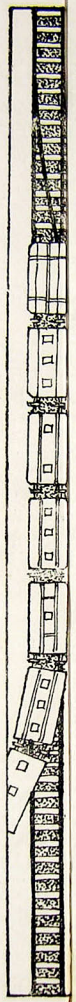

প্রবন্ধ

রহস্যময় প্রাচ্যবিদ্
নিত্যপ্রিয় ঘোষ

১৯১৩ সালের আগে নোবেলের সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার সময় সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটি পুরস্কার দিয়ে এসেছিলেন পুরস্কৃত সাহিত্যিকদের পূর্ণ সাহিত্যকৃতির জন্য। পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য যে সব শর্ত নোবেল তাঁর উইলে লিখে গিয়েছিলেন, তার অনেক শর্তই পুরস্কার দেওয়ার সময় মানা হতো না। নোবেলের শর্ত ছিল, পুরস্কার দেওয়া হবে, পূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের জন্য। কিন্তু ১৯১৩ সালের আগে পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কারণ হিসাবে যে citation পড়া হতো, তাতে দেখা যাচ্ছে বরাবর সাহিত্যিকদের পূর্ণ সাহিত্যকৃতির উল্লেখ করা হচ্ছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯০২ সালের পুরস্কার citation, যাতে বলা হলো মমসেনকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে History of Rome-এর জন্য। History of Rome অবশ্য ১৯০২ এর বছর কুড়ি আগে লেখা এবং প্রকাশিতও বটে।

১৯১৩ সালের citation-এ বলা হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো সেই কর্মের জন্য যার দ্বারা তিনি তাঁর নিজের ইংরেজিতে তাঁর কাব্যচেতনা প্রকাশ করে পশ্চিমের সাহিত্যের অঙ্গ করেছেন।[১]

১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর যখন citationটি প্রস্তুত হলো, তখন রবীন্দ্রনাথের নিজের ইংরেজিতে তাঁর নিজের কাব্যচেতনা প্রকাশিত হয়েছে তিনটি : Gitanjali (১ নভেম্বর ১৯১২), The Gardener (অক্টোবর ১৯১৩) এবং হয়তো The Crescent Moon (নভেম্বর ১৯১৩)।

নোবেলের শর্ত আবার লঙ্ঘিত হলো। শর্ত অনুযায়ী পূর্ব বৎসরে প্রকাশিত Gitanjali-ই কেবল বিবেচিত হতে পারত। citationটিকেই যদি আমরা প্রামাণ্য স্বীকৃতি বলে বিবেচনা করি, তাহলে হয়তো ভাবতে পারতাম Gitanjali-এর জন্যই রবীন্দ্রনাথ পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু পুরস্কারের ব্যাপারে আরো যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ঘোর সন্দেহ থেকে যাবে, Gitanjali-ই কমিটির লক্ষ্য ছিল অথবা অন্য কিছু। বিচারকদের কাছে, আমরা দেখতে পাব, Gitanjali ছাড়াও, The Gardenerও ছিল।

নোবেল পুরস্কারের নিয়ম অনুযায়ী পুরস্কারের জন্য বিভিন্ন নাম প্রস্তাব পেশ করার শেষ তারিখ সে বছর ৩১ জানুয়ারী। ১৯১৩ সালেও, সেই নিয়ম অনুযায়ী, নিশ্চয় প্রস্তাব পেশ হয়েছিল ৩১ জানুয়ারির আগেই। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থ বেরিয়েছে কেবল Gitanjali।

রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেছিলেন ইংরেজ কবি টমাস স্টার্জ মুর। একথা জানিয়েছেন, অ্যাণ্ডার্স অস্টারলিঙ।[২] তাছাড়া, কৃষ্ণ কৃপালনি জানিয়েছেন, তিনি স্বচক্ষে ১৯৫৯ সালে স্টকহলমে মুরের প্রস্তাবটি দেখে এসেছেন। তাঁর গ্রন্থের ১৯৬২ সালের সংস্করণে তিনি স্টার্জ মুরের চিঠির বয়ান উদ্ধৃত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৮০ সংস্করণে অজ্ঞাত কারণে বয়ানটি বাদ দিয়েছেন। যাই হোক, মুরের বয়ান ছিল,

As a fellow of the Royal Society of Literature of the United Kingdom, I have the honour to propose the name of Rabindranath Tagore as a person well qualified in my opinion to be awarded the Nobel Prize in Literature.[৩]

মুরের প্রস্তাবটি বিস্ময়কররূপে সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, সাহিত্যকীর্তি, দেশ,—এইসব বিষয়ে মুর নিঃশব্দ। ৩১ জানুয়ারি ১৯১৩ এর আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বাইরে অজ্ঞাত, অখ্যাত। তাঁর সম্পর্কে কোনো পরিচয় দেওয়া মুর আবশ্যক মনে করেননি। তাঁর একটা কারণ কি এই যে, এর বেশি কথা লেখার সুযোগ মুরের ছিল না। মুর বাংলা জানেন না, অতএব বাংলায় সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে লেখার অধিকার মুরের নেই। Gitanjali সম্পর্কে লিখতে গেলে তাঁকে লিখতে হয়, এটি ইংরেজি তর্জমা। সুতরাং মুর নিয়ম রক্ষার খাতিরেই প্রস্তাবটি পাঠিয়ে ক্ষান্ত থাকলেন, যা করার তা নোবেল কমিটিই করে নেবেন, নিশ্চয়ই এই আশায়।

নোবেল কমিটি ঠিক কী করেছিলেন তা আমাদের জানার উপায় নেই, অবলম্বন নোবেল কমিটির বিভিন্ন কার্যসমিতির বিবরণী। ১৯০১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত এবং তার পরেও নোবেল কমিটি যেসব বিচিত্র কারণে, উপায়ে এবং পদ্ধতিতে পুরস্কৃতদের মনোনীত করেছিলেন, সেই সব আমরা জানতে পারি এইসব কার্যসমিতির বিবরণী থেকে। বিবরণীগুলো তাজ্জব লাগানোর মতই এবং সেগুলো অবলম্বন করে রোমাঞ্চরহস্য কাহিনীর এক নামকরা লেখক আরভিঙ ওয়ালেস লিখেছেন তাঁর রোমাঞ্চ উপন্যাস The Prize। আরো নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করার আগে ওয়ালেস নোবেল কমিটির কার্যসমিতির বিবরণী থেকে কী পেয়েছিলেন, সেটা দেখে নেওয়া যাক। নোবেল কমিটির এক কাল্পনিক মুখপাত্র রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলছেন, বাংলা না জেনেও কীভাবে নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচিত করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে :

He had only one volume in English, when he was nominated. There were none in Swedish. The cream of his creativity was in his native Bengali. The four-men sifting board located a Swedish professor, an avid orientalist, who could read Bengali. So charmed was he by Tagore that he tried to teach our Academy members Bengali that they might appreciate the poet in his own tongue. But the Academy members found Bengali too formidable and awaited the professor's translation: It was accurate enough and beautiful enough to convince all that Tagore must have the prize[৪].

ওয়ালেসের বিবরণ কিছুটা সমর্থিত হচ্ছে অ্যাণ্ডার্স্ অস্টারলিঙের প্রবন্ধে। তিনি ১৯৬১ সালে নোবেল কমিটির সভাপতি এবং ১৯১৩ সালের পুরস্কার বিষয়ে লিখছেন কার্যসমিতির বিবরণী থেকে। তিনিও ওয়ালেসের মতো এক প্রাচ্যবিদের, Orientalist-এর উল্লেখ এবং নাম করছেন। এই প্রাচ্যবিদ্ Esaias Tegner, একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক এবং সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্য। অনুমান করা যায় তিনি অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটিরও সদস্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে তাঁর উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায় না। যাই হোক, অস্টারলিঙ জানাচ্ছেন, তাগনার বাংলা জানতেন এবং বাল্যবয়সে অস্টারলিঙ যখন তাঁর কাছে গিয়েছিলেন বাংলা শেখার জন্য (রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে

অস্টারলিঙের বাংলা বিষয়ে কৌতূহল জন্মেছিল), তাগনার খুব খুশি হয়েছিলেন। অস্টারলিঙ কিন্তু তাগনারের রবীন্দ্র-তর্জমার ব্যাপারে নিঃশব্দ, যেটা ওয়ালেস করেছেন। বরং তিনি বলেছেন, একজন সুইডিশ-নরওয়েজিয়ান অনুবাদকের কথা, যিনি গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছিলেন।

ওয়ালেস নিশ্চয়ই প্রাচ্যবিদ্ এবং অনুবাদক একই ব্যক্তি অনুমান করে নিয়েছেন, যদিও এঁরা দুই ব্যক্তি। অস্টারলিঙ-কথিত সুইডিশ-নরওয়েজিয়ান অনুবাদককে খুঁজে নেওয়া কঠিন না, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত Gitanjali-এর সুইডিশ অনুবাদিকা, জাতিতে সুইডিশ-নরওয়েজিয়ান, Andrea Butenschon-এর কথাই অস্টারলিঙ বলেছেন। ঠিক কবে এই সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় জানা যায় না তবে সেটা ঘটে ১৯১৩ সালে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১ নভেম্বর ১৯১২। Golden Book of Tagore-এ অ্যাণ্ড্রিয়া বুটেনশন যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন, সেই কবিতা থেকে জানা যাচ্ছে তিনি কোনো এক Misty Morning of Spring-এ রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম শোনেন। ১৯১৩ সালে বুটেনশনের গীতাঞ্জলি অনুবাদ বেরিয়ে গেছে, অতএব এই Misty Spring নিশ্চয়ই ১৯১৩ সালেরই, অর্থাৎ এপ্রিল-জুনের মধ্যেই। শুনতেই পারেন, কারণ মাস ছয়েক আগে ইংরেজি গীতাঞ্জলি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে শুনবেন? ইংল্যাণ্ডে আমেরিকায় সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা পড়ে নিশ্চয়ই। অথচ সুইডেনের যাঁরা কবি, হাইডেনস্ট্যাম বা হ্যালস্ট্রম, তাঁরা এইসব সমালোচনার কথা শোনেন নি। বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে এঁদেরই খবর রাখার কথা, কেননা এঁরা সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্য ও নির্বাচক। তাহলে কি এটা অনুমান করতে হবে, সুইডিশ অ্যাকাডেমির নির্বাচকমণ্ডলীর বোর্ডটি রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবপত্রে লক্ষ্য করে বুটেনশনকে অনুবাদ করতে বলেছেন, এবং যথাশীঘ্র সম্ভব বুটেনশন সেটা করে হাইডেনস্ট্যামকে দিয়েছেন?

সেই বছর যে ২৮টি নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি ছিল, যাঁরা অনতিবিলম্বে নোবেল পুরস্কার পাবেন, কার্ল স্পিটেলার (১৯১৯), নুট হামসুন (১৯২০), আনাতোল ফ্রাঁস (১৯২১), গ্রাজিয়া দেলেদ্দা (১৯২৬)। তা সত্ত্বেও, নির্বাচকদের বোর্ডটি যে উৎসাহ নিয়ে গীতাঞ্জলি অনুবাদ করাচ্ছেন, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, শুধুই কৌতূহল নয়, বোর্ডের ইচ্ছাও ছিল, রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হন। এই ইচ্ছার উৎস কি নিতান্তই অচেনাকে চেনার উৎসাহ?

কিন্তু, প্রশ্ন একটি থেকেই যায়। সরোজিনী নাইডুকে বুটেনশন বলেছিলেন, ইংরেজরা রবীন্দ্রনাথের নাম শোনার আগেই তিনি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। অথচ তিনি তো ইয়েটসের ভূমিকাসহ ইংরেজিতে প্রকাশিত গীতাঞ্জলিই অনুবাদ করেছেন। তাহলে? এমন কি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ Gitanjali-এর একটা typescript পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুইডেনে, যা থেকে বুটেনশন অনুবাদ করেছেন? এটা মনে হয় কষ্টকল্পনা, কেননা বুটেনশন ইংরেজিতে প্রকাশিত Song Offerings অনুসরণ করেন, ইয়েটসের ভূমিকাসহ। বুটেনশনের কথার তাৎপর্য হতে পারে, ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হৈ-চৈর আগে, সুইডেনের কেউ কেউ রবীন্দ্র খ্যাতির কথা শুনে থাকবেন।

সরোজিনী নাইডু বলেছেন, "One year I spent the winter in Scandinavia. You know that it is from Sweden that the Nobel Prize came to Tagore. So naturally Sweden was full of Tagore and the Swedish lady, who translated Gitanjali before England had heard of Tagore, was one of my hostesses. সরোজিনী একথা বলেছিলেন R. P. Soni-কে।[৫]

রচনাটি সরোজিনীর স্বাক্ষরিত নয়। হয়তো সোনি শুনতে ভুল করেছেন। কিন্তু সুইডেন যে ইংরেজির সাহায্য ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অবহিত ছিল, তার অকাট্য প্রমাণ Ernest Rhys-এর রবীন্দ্রজীবনী। ভূমিকায় রীজ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বিষয়ে খুব সংক্ষেপে এবং নিশ্চিন্তভাবে বলেছেন :

It was due to a distinguished Swedish orientalist who had read the poems in Bengali before they appeared in English.

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এভরিম্যান লাইব্রেরি সিরিজের সম্পাদক, Sadhana গ্রন্থের সংশোধক রীজ এমন নির্দ্বিধায় বলতে পারলেন, একজন সুইডিশ প্রাচ্যবিদের জন্যই রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারটি পেয়েছেন? এই প্রাচ্যবিদ্‌টি কে? সুইডিশ অ্যাকাডেমিতে একজনই বাংলা জানতেন বলে ওয়ালেস এবং অস্টারলিঙ আমাদের জানিয়েছেন—Esaias Tegner। তাঁর জন্যই রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার পেয়েছেন, এই তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যদি ধরে নেই প্রাচ্যবিদ্‌টি তাগনার।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তিনজন বিশেষজ্ঞের খোঁজ আমরা পেয়েছি যাঁরা নোবেল কমিটির কাছে রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে অভিমত দিয়েছিলেন। পের হালস্ট্রমের অভিমত পুরোটাই পাওয়া গেছে, হ্যারল্ড হেয়ার্ন

এবং ভার্নার ভন হাইডেনস্টামের আংশিক। তবে পুরস্কার বিতরণ সভায় হেয়ার্ন-এর বক্তৃতার পুরোটাও পাওয়া গেছে। এই অভিমতগুলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এদের ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার পাওয়ার কথা।

যদি Esaias Tegner-ই পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে থাকেন তাহলে বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে তাঁর উল্লেখ থাকারও কথা। কিন্তু কেউই তাগনার-এর কথা বলেন নি। এই অনুল্লেখের কারণ কী? ইচ্ছে করেই তিনজন চেপে গেছেন তাগনারের নাম? কারণ কী হতে পারে? তাগনার সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্য, বৃদ্ধ অধ্যাপক, বাংলা জানেন, তাঁর উল্লেখ বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হলো না কেন? এটা মনে রাখতে হবে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পেশ করা হচ্ছে সুইডেনেরই বিদগ্ধজনের কাছে, যাঁরা কী ঘটছে সে বিষয়ে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল আমাদের চাইতে, Rhys-এর চাইতে, Wallace-এর চাইতে। তাঁদের কাছে, বাংলা ভাষায় তাঁদের যে জ্ঞান সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই কোনো হাস্যকর দাবি করবেন না। তাঁদের সমস্ত জ্ঞানের মূলে যে তাগনার, যে তাগনার ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রখ্যাতির আগেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অবহিত, ওয়ালেসের ধারণা অনুযায়ী যে তাগনার রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন, সেই তাগনারের সামান্যতম উল্লেখও থাকবে না, যাঁকে রীজ ভাবছেন distinguished?

অস্টারলিঙের প্রবন্ধে হেয়ার্নের মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ফ্রান্সের সাহিত্য ইতিহাস রচয়িতা এমিল ফাগে। রবীন্দ্রনাথের Gitanjali কতটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এবং কতটুকু ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিনিধি, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। এই ব্যাপারে তিনি তাঁর পুরস্কার বিতরণ বক্তৃতাতেও আলোচনা করেছিলেন, তবে তখন তিনি সেটা সন্দেহের ভাষায় নয়, প্রশংসার ভাষায়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে মনে হয় তাঁর ইচ্ছা ছিল আরো এক বছর অপেক্ষা করা, যাতে রবীন্দ্ররচনার আরো অনুবাদ প্রকাশ হলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত চরিত্র। এ রকম প্রস্তাব না থাকলে হাইডেনস্টাম এমন কথা বলতে যাবেন কেন,

Now that we have finally found an ideal poet of really great stature, we should not pass him over. For the first time and perhaps for the last for a long time to come, it would be

vouchsafed us to discover a great name before it has appeared in all the newspapers. If this is to be achieved, however, we must not tarry and miss the opportunity by waiting till another year.[৭]

পূর্ববর্তী নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবিদের সম্পর্কে হাইডেনস্টামের উঁচু ধারণা ছিল না; প্রুদোম, মিস্ত্রাল, বিয়র্নসন, কিপলিঙের পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আশ্বস্ত, অবশেষে একজন যোগ্য কবির নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু হাইডেনস্টামের কথায় পরিষ্কার, অন্যত্র খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে আলোড়ন চলছে সে-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না, খবরের কাগজে হৈ চৈ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দিতে পারলে নোবেল কমিটি এই ভেবে খুশি হতে পারবেন যে একজন নতুন কবিকে আবিষ্কার করার গৌরব তাঁদের।

অস্টারলিঙ আরো জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজে হাইডেনস্টামকে Gitanjali উপহার দিয়েছিলেন।[৬] রবীন্দ্রনাথ যে হাইডেনস্টামকে চিনতেন পুরস্কার পাওয়ার আগে বা পরে, তার কোনো পরিচয় আমরা পাই নি। হাইডেনস্টাম নোবেল কমিটির সব চাইতে প্রভাবশালী সদস্য এবং তাঁর অভিমতই শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়েছিল। সেই হাইডেনস্টামকেই রবীন্দ্রনাথ Gitanjali দিয়েছিলেন—এ থেকে এমন সন্দেহ হতে পারে যিনি রবীন্দ্রনাথকে এই উপহারটি দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি সব জেনেশুনেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও পুরস্কার-ব্যাপারে তাঁর নাম বিবেচিত হচ্ছে এ বিষয়ে জানতেন। এটা তিনি বলেওছিলেন এডোয়ার্ড টমসনকে।

Rabindranath told me the award was not altogether a surprise. When in England, he had been asked to send copies of his books and press cuttings to the Nobel Prize Committee.[৭]

শান্তিনিকেতনে রক্ষিত টমসনের কিছু টাইপ করা নোটস্ থেকে জানা যায় ১৯১৩ সালেই, পুরস্কার পাওয়ার দুয়েকদিন পর, রবীন্দ্রনাথ টমসনকে একথা জানান।

শান্তিনিকেতনে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ডের বন্ধুদেরও জানার কথা যে নোবেল পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথ আলোচিত হচ্ছেন। স্টকহোলমের নোবেল লাইব্রেরী বলছে টাইমস বুক ক্লাবকে রবীন্দ্রনাথের বই পাঠাতে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হবেন।[৮] সেই ক্লাব

জানাচ্ছে সে কথা ম্যাকমিলান এবং তারপর স্ট্র্যাঙ্গওয়েজকে। মুর প্রস্তাবটির কথা জানেন, কেননা তিনিই রবীন্দ্রনাথের নাম পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন কেননা তাঁকে বই পাঠাতে বলা হচ্ছে। স্ট্র্যাঙ্গওয়েজও দেখা যাচ্ছে, জানেন। কিন্তু রথেনস্টাইন জানেন না, তাঁর চিঠিপত্রে, স্মৃতিকথায় তার কোনো প্রমাণ নেই, বরং নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে রথেনষ্টাইন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কথাই আছে চিঠিপত্রে। রীজের ভূমিকা পড়ে মনে হয়, ভেতরের কথা তিনিও পরে শুনেছিলেন, ঠিক কীভাবে পুরস্কারটি দেওয়া হলো সেই গূঢ় তথ্যটি নির্বিকারভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ জানেন, কেউ কেউ জানেন না, এই জন্যই কি পুরস্কার ঘোষণার পর তাঁর ইংরেজ বন্ধু মহলে একটা বিচ্ছেদ, বিভেদ বা অশান্তি দেখা গিয়েছিল? এবং এই জন্যই কি মুর রবীন্দ্রনাথকে ২২ জানুয়ারি ১৯১৪ এই চিঠি লিখেছিলেন :

Your having won the Nobel Prize when Hardy had been the official candidate of the Royal Society of Literature (that is, the only candidate for whom the votes were canvassed) has made you a certain number of enemies whose ill will is not solely due to the fickleness of their minds.[৯]

হাইডেনস্টাম প্রসঙ্গে ফেরা যাক। অস্টারলিঙ জানিয়েছেন, হাইডেনস্টাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া (অথবা অনুবাদ) Gitanjali যেমন পড়েছিলেন তেমনই পড়েছিলেন একজন সুইডিশ-নরওয়েজিয়ানের অনুবাদ, যদিও সেই অনুবাদ ভালো হয় নি। অ্যাণ্ড্রিয়া বুটেনশন তাহলে পুরস্কার ঘোষণার আগেই অনুবাদটি করে ফেলেছিলেন, ছাপিয়ে যদি না-ও থাকেন। প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রনাথের নাম এর আগে হাইডেনস্টাম, হালস্ট্রম এবং হেয়ার্নের মতো কবি-সাহিত্যিকেরা শোনেন নি, কিন্তু অ্যাণ্ড্রিয়া শুধুই শোনেন নি, অনুবাদও করে ফেলেছেন, এবং সরোজিনী নাইডুর কথা সত্য হলে, বাংলা থেকেই। এ বিষয়ে যদি তাগনারই মূল ব্যক্তি হন, সেই তাগনারের নাম বিশেষজ্ঞরা একেবারেই করবেন না? তাহলে কি এই অনুমান সঙ্গত নয়, এই orientalist, যাঁর কথা আর্ভিঙ ওয়ালেস এবং রীজ করছেন, তিনি তাগনার নন, অন্য কেউ? এবং এমনই একজন, নোবেল কমিটি তাদের কার্যবিবরণে যাঁর নাম লিপিবদ্ধ করতে পারছেন না? এবং এই orientalist এর নাম Esaias Tegner ভেবে অস্টারলিঙও বিপদগামী হয়েছেন?

এই সমস্যার একটি সমাধান আছে। Gitanjali পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার পর, ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে যখন তখনই রবীন্দ্রনাথ বুটেনশন বা সুইডিশ প্রকাশক বা কারো কাছে সেই পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি পাঠিয়ে থাকবেন, যার ফলে ১৯১৩ সালেই Gitanjali-এর সুইডিশ অনুবাদ সম্ভব হয়, হাইডেনস্টামের হাতে সেই অনুবাদ হাতে আসে। অনুবাদের কারণ, নোবেল পুরস্কার বিবেচনার সহায়তা। অনুবাদ যখন সুইডেনে ঘটছে তখন ইয়েটসের ভূমিকাও প্রকাশকের হাতে এসে গেছে। সুতরাং সেটারও অনুবাদ প্রকাশক গ্রন্থস্থ করে দিয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের জন্য সুইডিশ অনুবাদ অত্যাবশ্যক ছিল না, ইংরেজি অনুবাদই যথেষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও সুইডিশ অনুবাদ করা হচ্ছে, অর্থাৎ ইংরেজি অনুবাদ যখন হচ্ছে, সুইডিশ অনুবাদও তখন হচ্ছে, ইংরেজি অনুবাদ কবে বেরুবে সেটা না জানার জন্য। তাহলে বুটেনশনের Misty Morning of Spring ১৯১৩ সালে না হয়ে ১৯১২ সালও হতে পারে।

এই যুক্তির স্বপক্ষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে প্রকাশিত হওয়ার আগেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ অন্তত একটি ক্ষেত্রে অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। ১৯১৩ সালের মে-জুন মাসে ইয়েটস এবং রবীন্দ্রনাথ The Gardener-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি ইয়েটসকে দেওয়ার আগেই তিনি ১৯১৩ ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা থেকে এক জার্মান প্রকাশককে পাঠিয়ে দেন, যারা নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর সেটা প্রকাশ করে।[১০] সুতরাং, Gitanjali-এর পাণ্ডুলিপি সুইডেনে পাঠিয়ে দেওয়ায় নতুন কিছু ঘটছে না। মনে রাখা দরকার, নোবেল কমিটিতে সাধারণতঃ সুইডিশ ছাড়া ইংরেজি, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান এই চার ভাষা জানা বিশেষজ্ঞেরা থাকতেন।

ইয়েটসের ভূমিকা পর্যাপ্ত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছে শোনা কিছু বিক্ষিপ্ত মতামত ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কোনো তথ্যই ইয়েটস দেন নি। তাঁর এই ফেনিল ভূমিকা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। যদি তাগনারের উৎসাহেই বুটেনশন অনুবাদ করে থাকতেন, তাহলে তাগনারের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে তিনি স্বয়ং বা তাগনার ভূমিকা লিখতে পারতেন। কিন্তু ইয়েটসের ভূমিকা নেওয়াতেই আবার সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, এই পুরস্কার বা রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে তাগনার কোনোমতেই আসেন নি।

অস্টারলিঙ ছাড়া আর কেউ তাঁর নাম করেন নি এবং অস্টারলিঙও কেবল বলছেন তাগনার বলে এক বাংলা-জানা প্রাচ্যবিদ্ অ্যাকাডেমিতে ছিলেন। ওয়ালেস বা য়ীজের ওই প্রাচ্যবিদ্ অন্য কেউ।

হ্যালস্ট্রমের রিপোর্ট আরো তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন ২৯ অক্টোবর। সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট পেশ করার কথা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের গোড়ায়, যাতে অক্টোবরের শেষে একবার এবং নভেম্বরে একবার এই দুটো সভায় আঠারোজন সদস্য সমবেত হয়ে প্রথম সভায় আলোচনা করতে এবং দ্বিতীয় সভায় ভোট দিতে পারেন। হাইডেনস্টামের প্রকাশিত অসম্পূর্ণ রিপোর্ট থেকে মনে হয় তিনি Gitanjali-এর উপর রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কবে দিয়েছিলেন জানা যায় নি। হ্যালস্ট্রম কিন্তু অস্বাভাবিক দেরি করেছেন রিপোর্ট পেশ করতে। তাঁর একটা কারণ ১৫ অক্টোবরের পর প্রকাশিত The Gardener-এর উপরই তাঁর মূল রিপোর্ট। The Gardener তাঁর রিপোর্টে আসছে কেন? হেয়ার্ন তাঁর পুরস্কার বিতরণ বক্তৃতায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যে ইংরেজি রচনা চলতি বছরে প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ এর আগে প্রাপ্ত মনোনয়ন পত্রে চলতি বছর নিশ্চয় ১৯১২। ১৯১২-তে প্রকাশিত Gitanjali-এর উপরই বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা, যেখানে বলাই হচ্ছে চলতি বছরে ইংরেজি রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো।

হ্যালস্ট্রমের রিপোর্টটি[১১] খুবই বিচিত্র। তাঁর রিপোর্টে দুটো ভাগ, একটি Gitanjali বিষয়ে আর একটি The Gardener বিষয়ে। প্রথম ক্ষুদ্র অংশটি লেখার পর তিনি বলেছেন, তাঁর এই অংশটি পাওয়ার পর তিনি তিনটি খবরের কাগজের রিপোর্ট পেয়েছেন, যেগুলোর সঙ্গে তাঁর মতামত মিলে যাওয়াতে তিনি খুশি। রিপোর্টগুলো The Times (৭ নভেম্বর ১৯১২), Fortnightly Review (মার্চ ১৯১৩), The Nineteenth Century (এপ্রিল ১৯১৩)। হ্যালস্ট্রম তাহলে এই অংশটি লেখেন ফেব্রুয়ারি-মে ১৯১৩ এর মধ্যে। তার পরের অংশ লেখেন ১৫ অক্টোবর-২৯ অক্টোবর ১৯১৩ এর মধ্যে। এই দীর্ঘ সময় নেওয়ার উদ্দেশ্য কী? সেটা কি এই শুধু Gitanjali পড়ে তিনি কোনরকম মতামত চূড়ান্ত করতে ভরসা পাচ্ছেন না? তাই তিনি তাঁর রিপোর্টের প্রথম ভাগে বলছেন,

I hereby wish to suggest that if there is a possibility of

acquiring the services of a person inside or outside the country, competent to judge the value of the originals, this should be done.

তাহলে এখনও মে ১৯১৩ পর্যন্ত, সিদ্ধান্ত হয় নি রবীন্দ্রনাথের original-এর জন্যই অথবা তর্জমার জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। এই জন্যই মে-জুন মাসে রবীন্দ্রনাথের কাছে, Times Book Club-এর কাছে, আরো বাংলা বই চাওয়া হচ্ছে। আর তাগনার সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে হ্যালস্ট্রম কিছুই জানেন না অথবা তাঁর কোনো শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে হাইডেনস্টাম বদ্ধপরিকর, Gitanjali-ই যথেষ্ট। সেটাকেই আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হ্যালস্ট্রম শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন কবে The Gardener বের হয়।

হ্যালস্ট্রম যে বলছেন তাঁর Gitanjali বিষয়ে মত লিপিবদ্ধ করার পর তাঁর হাতে এসেছে ওই তিনটি পত্রিকার কর্তিকা, তাতে বোঝা যাচ্ছে, তিনিও ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার রবীন্দ্র-প্রশস্তি বিষয়ে পূর্বে অবহিত ছিলেন না। তুজন মূল বিশেষজ্ঞ, হাইডেনস্টাম এবং হ্যালস্ট্রম, ইংল্যাণ্ডের মাধ্যম ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অবহিত হয়েছেন।

অবহিত হতেই পারেন, কেননা মুর প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কিন্তু ২৮টি প্রস্তাবের একটি প্রস্তাব নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এমন উঠে পড়ে লাগলেন কেন, যে প্রস্তাবের বিষয় সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না? এমন কোনো সূত্র থেকে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছে যে জন্য তাঁরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন?

যদিই-বা ধরা যায় এই সূত্রটি তাগনার, তাহলে তাগনারের নাম উল্লেখ না করার কোনো কারণই নেই। বুটেনশনের দাবী ইংল্যাণ্ডের আগেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথে আগ্রহী। যদি তাই হয়ে থাকবে তাহলে তাগনারের সাহায্যে মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ তাঁরা করতে পারতেন। তা যে করেন নি, Gitanjali-এর জন্য, তাঁদের ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির জন্য বসে থাকতে হয়েছিল, তাতে এটাই প্রমাণিত হয়, রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁরা শুনেছিলেন সত্যিই এমন সূত্র থেকে যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, রবীন্দ্র গ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন জায়গার সন্ধান করছেন এবং ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছেন যাতে প্রস্তাবটি কোনমতেই উপেক্ষা করা না যায়।

হ্যালস্ট্রম শুরু করেছিলেন, কাউকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা পড়িয়ে

নেওয়া যাক। হেয়ার্নও মনে করেছিলেন, আরো এক বছর অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু হাইডেনস্টাম জানালেন, Gitanjali-ই যথেষ্ট। সুতরাং হ্যালস্ট্রম পাঁচ মাস, পর তাঁর রিপোর্ট শেষ করে বললেন, ইংরেজি রচনার জন্যই পুরস্কার দেওয়া হোক, Gitanjali এবং The Gardener তো প্রকাশিত হয়েই গেছে। মূলে যে প্রস্তাব ছিল বলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার জন্য পুরস্কার বিবেচনা, সেটা পরিবর্তিত হলো, ইংরেজি তর্জমার জন্য।

সেইজন্যই হেয়ার্ন তাঁর পুরস্কার বিতরণ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে বর্ণনা করলেন An Anglo-Indian কবি বলে। হেয়ার্ন এই বক্তৃতায় তাঁর রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে কোন সঙ্কোচের উল্লেখ করেন নি, রবীন্দ্রনাথের কতটুকু নিজস্ব কতটুকু ভারতীয় ঐতিহ্যের সেই প্রশ্নও তোলেন নি। তাঁর রবীন্দ্ররচনা বিষয়ে মতামত দেওয়ার আরো সুবিধা হয়ে গিয়েছিল কেননা ১০ ডিসেম্বর নাগাদ তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি অনুবাদগ্রন্থ হাতে এসে গিয়েছিল। মোটামুটি তা থেকেই তিনি মতামত গঠন করেছিলেন। এখানেও তিনি তাগনারের কোনো উল্লেখ করেন নি। ইয়েটসের ভূমিকা বা রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি অনুবাদের বাইরে তিনি যা বলেছিলেন তার বেশ খানিকটাই হাস্যকর। খৃস্টধর্মের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য নতুন করে গড়ে উঠেছে বা রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাবক্ষে সাধুর জীবন সাঙ্গ করে সংসার আশ্রমে ফিরে আসেন, এই ধরনের কথাবার্তার উৎস কী দেখা যাচ্ছে না।

এই বিশ্লেষণ থেকে তাহলে ঘটনা-পরম্পরা কী হয়েছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে।

১৯১১-১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে, জীবনে, বোধে একটা অবসাদ এসেছিল। এমন সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো সুইডেনের যুবরাজের। যুবরাজ চাইলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের লোক জানুক। রবীন্দ্রনাথের রচনার শুধুমাত্র গল্পের অনুবাদ বেরিয়েছে Modern Reviewতে। সেইসব তর্জমা বা নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ খুশি নন।[২১] কবিতা অনুবাদ হয়েছে অল্পই। শিলাইদহের নির্জনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তর্জমা শুরু করলেন।

রবীন্দ্রনাথের ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সঙ্গে যুবরাজের তর্জমা করার অনুরোধের কোনো সম্পর্ক নেই। ইংল্যাণ্ড যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে ১৯১১ থেকেই। যুবরাজের সঙ্গে তাঁর আলাপ ১৯১২ সালে। রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ডে যাওয়া, তর্জমা করা, বন্ধুবান্ধবকে তর্জমা শোনানো, ইণ্ডিয়া সোসাইটির

Gitanjali প্রকাশ—এই সবের সঙ্গে যুবরাজের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যুবরাজ তাঁর নব-পরিচিত বিখ্যাত কবিকে নোবেল পুরস্কার দিতে আগ্রহী। মুরের প্রস্তাবের সঙ্গে যুবরাজের কোনো সংযোগ আছে কিনা জানা যায় নি, কিন্তু মুরের প্রস্তাবটি এতই আকস্মিক যে, এটা একেবারে মুরের সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তা, এটা গ্রহণ করা কঠিন। যুবরাজ উইলিয়ামের উৎসাহে নোবেল কমিটি গুরুত্ব সহকারে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করলেন। ১৯১৩ সালেই যে পুরস্কার দিতে হবে এমন সংকল্প তাঁরা নেন নি। হেয়ার্ন অপেক্ষা করতে চাইলেন। একটি তর্জমা-গ্রন্থের জন্য না দিয়ে আরো কিছু তর্জমা বের হোক, এই তাঁর ইচ্ছা। হ্যালস্ট্রমেরও প্রাথমিক ইচ্ছা তাই ছিল। নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের কাছে বই এবং রিপোর্ট চাইলেন। নোবেল প্রাইজ লাইব্রেরিও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সংগ্রহ করছেন। তখনও পর্যন্ত তাঁদের সংকল্প রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সাহিত্যের জন্যই পুরস্কার দেবেন। ইতিমধ্যে তাঁরা ইংল্যাণ্ডের ও আমেরিকার সমালোচকদের মাধ্যমে জানলেন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি তর্জমা মৌলিক সাহিত্যের মতই অনবদ্য। অতএব আর তর্জমার প্রয়োজন নেই। হাইডেনস্টাম Gitanjali এবং হ্যালস্ট্রম Gitanjali ও The Gardener পড়ে রায় দিলেন, এর জন্যই রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারযোগ্য।

Citation-এর ভাষাটি লক্ষ্য করবার মতো। ইংরেজিতে প্রকাশ করা অথবা পশ্চিমের সাহিত্যের অঙ্গ করার সঙ্গে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। নোবেলের উইলের কথামতো, যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষার সাহিত্যই পুরস্কারযোগ্য। তাহলে ইংরেজি বা পশ্চিমের সাহিত্যের প্রসঙ্গ ওঠে কেন?

আসলে, এটা পুরস্কার দেওয়ার কারণ নয়, হয়ত পুরস্কার দেওয়ার কৈফিয়ৎ। নোবেল কমিটির কেউই বাংলা জানেন না, অথচ বাঙালি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, অতএব প্রশ্ন উঠতেই পারে, কীসের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে? নোবেল কমিটির তাই কৈফিয়ৎ, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখাকেই তাঁরা পুরস্কৃত করছেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখা কিন্তু মৌলিক লেখা নয়, স্বকৃত ইংরেজি তর্জমা। মৌলিক লেখা ছাড়া পুরস্কার দেওয়া যায় না, এটাও নোবেল পুরস্কারের রীতি। অতএব, নোবেল কমিটিকে ইঙ্গিত করতে হচ্ছে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখাকে তর্জমা বলে গণ্য করছেন না, পশ্চিমের সাহিত্যের অঙ্গ বলে মনে করছেন, Gitanjali ইংরেজি মৌলিক রচনা।

Gitanjali এবং The Gardener-এর ভূমিকায় যদিও বলা ছিল, এগুলো তর্জমা, মৌলিক রচনা নয়।

এই ঘটনাক্রম এবং ১৯১২-১৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় কবি-সমালোচক মহলে আলোড়ন কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু এই আকস্মিক যোগাযোগের ফলে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, মনে করেছিলাম তাঁদের উচ্ছ্বাসই নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একজন প্রাচ্যবিদ্, এবং তিনি তাগনার নন, যুবরাজ উইলিয়াম। রাজবংশের সঙ্গে নোবেল ফাউণ্ডেশনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়। ফাউণ্ডেশন বরাবরই সেটা নেপথ্যে রাখতে চান। তাই প্রাচ্যবিদের আড়ালে যুবরাজকে নোবেল কমিটি প্রকাশ করেন নি। ফলে, এত বিভ্রান্তি।

প্রশ্ন ওঠে, নোবেল কমিটির কার্যবিবরণে যে প্রাচ্যবিদের কথা পাওয়া যাচ্ছে, যে প্রাচ্যবিদের কথা অস্টারলিঙ এবং ওয়ালেস পড়েছেন, রীজ শুনেছেন, সেই প্রাচ্যবিদের কথা স্পষ্ট কেন লেখা হলো না? আমাদের অনুমান, যুবরাজ উইলিয়ামকে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য কার্যবিবরণে প্রাচ্যবিদের উল্লেখ করা হয়েছে, নাম করা হয়নি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, উইলিয়াম রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করতে বা করাতে বলবেন বলে আমরা অনুমান করছি কেন, যেখানে বাংলা ভাষার সাহিত্যের জন্যই পুরস্কার দেওয়া যেত। এর উত্তর, অনুবাদের উপর নোবেল কমিটি বরাবরই জোর দিয়ে এসেছেন। একটি সাহিত্যের অনুবাদ হচ্ছে, এর অর্থ, সেই সাহিত্য নিজস্ব দেশের গণ্ডীর বাইরেও আদৃত হচ্ছে। ১৯১২ সালের একটি চিত্র মনে করা যাক। ১৯১২ সালে যাতে হেনরি জেমস নোবেল পুরস্কার পান তার জন্য আমেরিকার আর এক ঔপন্যাসিক ইডিথ হোয়ার্টন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, ইংল্যাণ্ডে এডমণ্ড গসকে দিয়ে, আমেরিকায় ডবলিউ ডি হাওয়েলসকে দিয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন, সুইডিশ অ্যাকাডেমিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন হেনরি জেমসকে পুরস্কার না দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু নোবেল কমিটি হেনরি জেমসকে পুরস্কার দেন নি, তাঁদের দ্বিধার একটি কারণ, জেমসের লেখার অনুবাদ হয়নি, অতএব বিশ্ব সাহিত্যে জেমসের স্থান নেই। সেবার পুরস্কার পান মেটারলিঙ্ক। অনুবাদের উপর জোর দেওয়ার আর একটি কারণ, নির্বাচক-মণ্ডল ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী এবং স্প্যানিশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন

না, তাঁদের সমর্থনের জন্য এই চার ভাষার যে কোনো ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন।

যুবরাজ উইলিয়াম ১৯১২ সালে কলকাতায় এসেছিলেন বিশ্বভ্রমণ উপলক্ষ্যে। কলকাতায় তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন, কলকাতার প্রাচ্যকলার কেন্দ্র হিসেবে, ঠাকুরদের সঙ্গে পরিচিত হতে। সুইডেন ফিরে গিয়ে তিনি Where The Sun Shines (১৯১৩) প্রকাশ করেন, যাতে তিনি ঠাকুরদের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেন। অ্যারনসন তাঁর গ্রন্থে এই অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। শান্তিনিকেতনেও এর কর্তিকা রক্ষিত আছে।[১৩] প্রাচ্যদেশগুলোতে ভ্রমণ করার জন্যই কি রীজ তাঁকে Orientalist এবং রাজবংশের লোক বলে distinguished বলেছেন? উইলিয়াম অবশ্য বাংলা জানেন না, কিন্তু রীজের তথ্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য? নোবেল কমিটির ধরণ-ধারণ তিনিও জানেন না, তিনি যা বলছেন, তা-ও শোনা কথা। উইলিয়াম বাংলা জানেন না, এটা তিনি জানতেন না। তিনি তাগনারকেও লক্ষ্য করে কথাটি বলেন নি, কারণ তাগনারের নাম নোবেল বিশেষজ্ঞরা কেউই করেন নি। তাগনারই Orientalist হলে, এতো রহস্যের প্রয়োজন হতো না।

উৎস-নির্দেশ

১. Nobel Lectures, Literature 1901-67, Elsevier Publishing Co, 1969.

"Rabindranath Tagore because of his profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse, by which, with consummate skill he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West."

২. Tagore and Nobel Prize, Anders Osterling, Sahitya Akademi Tagore Centenary Volume, 1961.

৩. Rabindranath Tagore, A Biography, Krishna Kripalani, 1962.

৪. The Prize, পৃ ৩২০, New English Library (1981)

৫. Tagore Centenary Souvenir, Tagore Memorial Publications, New Delhi, 1961, পৃ ১১৭.

৬. Tagore and Nobel Prize, Anders Osterling. অস্টারলিঙের ভাষা অবশ্য দ্ব্যর্থক। Writing of Gitanjali, which Tagore himself

had presented in English Heidenstam had also learnt to know in a Swedish—Norwegian translator's rather inadequate rendering। এখানে presented কথাটির মানে অনুবাদও হতে পারে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে (৫র্থ খণ্ড, পৃ ৩২৭, ১৯৬৪ সংস্করণ) অবশ্য অনুবাদ অর্থে না নিয়ে উপহার অর্থেই নিয়েছেন। অস্টারলিঙ তাঁর প্রবন্ধটি সুইডিশে লিখেছিলেন, যার ইংরেজি অনুবাদ সাহিত্য আকাদেমির সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। মূল সুইডিশে presented শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল জানা গেলে এই সন্দেহের নিরসন হবে।

৭. Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist, Edward Thomson, 1948 : পৃ ২২৩.

৮. ফক্স স্ট্র্যাঙওয়েজকে Times Book Club-এর সেক্রেটারির চিঠি, ২০ মে ১৯১৩ : We have been referred to you by Messrs Macmillan in connection with an enquiry we have received for a list of books in the Bengali language by Rabindranath Tagore, also for any articles which have appeared in the dealihg with this author or his works. If you could assist us in this enquiry, we should be very greatly obliged. I may add that the enquiry comes from the Nobel Library at Stockholm and that the fullest possible information is likely to be of use to Mr. Rabindranath Tagore in that quarter. স্ট্র্যাঙওয়েজ ছিলেন ম্যাকমিলানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের সূত্র, গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে।

৯. শান্তিনিকেতনে রক্ষিত মুর-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলী।

১০. Thuringer Tageblat, 16. 8. 61 : Verbinderte Ablehnung Zu Einem Tagore-Manuskript (Sensational Discovery of Tagore's Manuscripts) : যুগান্তর (৬. ৫. ৮৪) পত্রিকায় লাডলীমোহন রায়-চৌধুরীর প্রবন্ধে উল্লেখিত।

১১. Indian Literature, Tagore Number, Sahitya Akadami, 1961.

১২. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২।

১৩. শান্তিনিকেতনে রক্ষিত Truth-এর কতিকা।

কবিতাগুচ্ছ

উৎপলকুমার বসুর কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

১৯৬০ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যবর্তী দিনগুলির কথা মনে পড়ে। এই অন্তর্বর্তী সময়েই বেরিয়েছিল উৎপলের প্রথমে 'চৈত্রে রচিত কবিতা' পরে 'পুরী সিরিজ'। সে কি তুমুল হৈ চৈ, সে কেমন প্রবল ছর রে তরুণদের। বস্তুত সমসময়ে 'পুরী সিরিজের' মতো এমন পুরোপুরি মৌলিক সংঘটন খুব বেশি হয়নি। দেখতে এক ফর্মা-ক্রশ, কিন্তু ওজনে প্রায় খান ইটের ভার নিয়ে এসে লেগেছিল মাথায়। পরবর্তী বয়সের ও প্রজন্মের কবিদের মাথায় সে ইটের ক্ষত যে দীর্ঘদিন ছিল তা বোঝা যায় উৎপলের তৎকালীন অনুকারকদের সংখ্যাধিক্য দেখে। স্বীকার করা ভাল সুরু-পঞ্চাশের খ্যাতনামা কবিদের কারো প্রভাবই উৎপলের মতো পড়েনি অনুজ কবিদের ওপর সেই সময়ে। উৎপলের রচনার সেই বিশেষ শৈলীর আপাত মোহে তখন পড়েছিলেন অনেকেই।

এসব এখন আর অজানা নয়। পুনরুল্লেখ শুধু এই কারণে যে উৎপলের সেই লিখনভঙ্গিমাকে বাংলার রবীন্দ্রলিপ্ত ট্রাডিশানে তখন অনেকটাই কারো কারো কাছে মূলত স্টান্ট বলে মনে হয়েছিল। উৎপলের কবিত্বের পঙ্কজবর্ণ ও তার শিকড়ের সন্ধান অনেকেই তখন পাননি। মন্থরাপ্রবণ লাইনের মাঝখানে কি করে নামিয়ে আনতে হয় কবিত্বের চকিত বিদ্যুৎ, মেশিনলুমের আওয়াজের সঙ্গে মেশাতে হয় তানপ্রধান ভোরের ভৈরবী—সেটা প্রচলিত সড়কের সৌখিন শব্দসেবীদের ছিল অজানা। ফলে উৎপলের অনুকারকের সংখ্যা যতো বেড়েছিল, প্রকৃত বৈশিষ্ট বোদ্ধার সংখ্যা তেমন বাড়েনি।

জানি না এসব কারণেই তিত্-বিরক্ত হয়ে লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল কিনা উৎপল। যেন অনেকটা 'ধুত্তোর' বলেই শব্দ সাজানো বন্ধ করে দিয়েছিল। চলে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে দূরে। অবশ্য অন্য একটি কারণও ছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তার যে কবিতাকে পাঠক চালাক কবিতা বলত, তাকে সম্পূর্ণই তালাক দিয়ে ডুবে ছিল পাথর নীরবতায়। কবিতা নামক মিডিয়ামটি সম্পর্কে জেগে উঠেছিল এক গভীর দোলাচল। নানারকম মিক্সড-মিডিয়াম-এর কথা বলতো সে সময়। দীর্ঘ প্রবাসের মাঝখানে হঠাৎ একবার কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফেরে উৎপল। আমি সে সময় 'কৃত্তিবাসের' দেখাশোনা করছি। বললাম লেখা দিতে। কৃত্তিবাসও তো উৎপলেরই। একসঙ্গে কলেজ স্ট্রীট থেকে বাসে ফিরছি দক্ষিণ কলকাতা। পাশাপাশি। কবিতার জন্য অনুরোধের উত্তরে অনেকক্ষণ নিরুত্তর উৎপল। যেন কোনো ব্যর্থপ্রেমিকার প্রশ্নে তাকে বিব্রত করা হয়েছে! আমার প্রশ্ন বজায় রাখার ধৈর্য দেখে, ধীরে ধীরে তৎকালীন নতুন চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস—অবিশ্বাসের কথা, মিক্স-মিডিয়ামের কথা, জানিয়েছিল। আমার মনে আছে, উৎপলের এমন সর্বাঙ্গীন কবিতা-নিস্পৃহতা তখন থেকেই বিস্ময়চিহ্ন হয়ে থেকে গিয়েছিল স্মৃতিতে।

তারপর পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে প্রথম দু-এক বছর কবিতা সম্পর্কে তাকে তেমন উৎসাহী দেখিনি। ক্রমে দু-একটা কবিতা চোখে পড়তে থাকলো। প্রকাশিত হলেই সাগ্রহে পড়েছি। বহুকাল ছেড়ে থাকার কারণে সেই প্রাথমিক লেখাগুলিতে স্বাভাবিক প্রখর ঔজ্জ্বল্য, বাক্‌পটুতা থাকলেও কিছু কিছু জার্ক-ও ছিল। তারপর উৎপল ক্রমশই ফিরে এলো নতুন এক স্পন্দে। সাধারণত প্রচলিত-ছন্দবিমুখ উৎপলের রচনায় ফিরে এলো ছন্দ।

'বিভাবের' জন্য দেশে ফেরার পর থেকেই কবিতা চেয়ে চেয়ে যখন ক্লান্ত (বছরে যার কলমে পাঁচ-ছটির বেশি কবিতা আসে না, তার কাছে গুচ্ছ-কবিতা চাওয়া কিছুটা উচ্চপ্রার্থনাও বটে!) তখনই এক ভোরবেলা এসে উৎপল দিয়ে গেল তাঁর এই রচনাটি। বোধহয় এই প্রথম বোধি ও মেধার এলাকার পথ অনেকটাই ছেড়ে উৎপল চলে এসেছে উপনিষদের মতো গভীর পবিত্র এক সারল্যের কাছে। এ এক সম্পূর্ণ নতুন বাঁক। এখান থেকে এবং এখন থেকে এই রাস্তার সামনে তাকালে যা দেখা যাবে তার নাম দিগন্ত। যেখানে আর কোনো অমূলক রৌদ্র বা উপমাবিষণ্ণ জ্যোৎস্না নেই। নেই শব্দ ও উপমার মারপ্যাঁচ। আছে শুধু নীল, অকুণ্ঠ নীলিমার ভবিষ্যৎ।

উৎপলকুমার বসুর কবিতা

খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন

যেন প্রাণ যেন উজ্জীবন—
কে না জানে অনৃতকথন
কে না জানে অপলাপী ভাষা
শিকারীর বাঘের প্রত্যাশা
শিকারীর পিছু পিছু ধায়
ছায়া-বাঘ বনের ছায়ায়
হে সন্ধান প্রাপ্য ও প্রাপক
এসো চাটি রক্তমাখা নখ

O

পাখিরা যে-গান গায় সেকি সদুপদেশের গান—
সেকি শবের সম্মান—
সেকি আহ্বান করে
উড়ে এসো অতৃপ্ত আহারে
এই মৃতদেহটির পাড়ে
এসো এর রক্তে করো স্নান
ছিন্ন করো পেশীর বাগান
উৎখাত করো যত ফুল
ঐ কোষ ঐ স্নায়ু ঐ কালো চুল
ওর বীজ করো বিষময়
স্তব্ধতার এই তো সময়
স্তব্ধতায় কানা করো হাত
অঙ্গহীন এরই লেখপাত

O

দিন যায় রাত্রি নেমে আসে
বল্লভপুরের মাঠ ভরে ওঠে তৃণের নিশ্বাসে
বাঁকা শিক তুমি আজ কত না আদরে
জড়িয়ে ধরেছো গলা
ছাখো ফুলে-ওঠা ত্বক
ছাখো কুষ্ঠের ছোঁয়া-লাগা ছুটন্ত তক্ষক
আমার দু'পাশে

O

রাগ থেকে জন্ম নেয় স্বতন্ত্র মাদুলি
দুর্বাআগুন থেকে ঝলসানো মাংসপাখির
পিণ্ডহৃদয়সম তাই হাতে বাঁধি
যে-হাত অদূরে ছিন্ন কাটা পড়ে আছে

O

রাত্রির প্রান্তে জলে জ্যোৎস্নাময়ী সিঁথি যার
সেই মেয়ে আমার প্রেতিনী কামড়ে ধরেছে দাঁতে এ-মরজগত
শুনি বাঁশবনে ছুটোছুটি প্রচণ্ড হুল্লোড় কান্না
আসীন বৃদ্ধের জটিল নিদ্রা ভেঙে যায়

O

সবুজতা খণ্ড হ'তে পারে তাই উড়ে আসে বাজপাখি
ঠোঁটে যার মৃতের হলুদ মাংস ধানক্ষেত এদিক-ওদিক
ছড়িয়ে পড়েছে অস্ত্র জাল যেন ভোরবেলা ফাঁসি-বোনা বাঁধো
শস্যের সবুজ তার হাহাকার তার বীভৎসতা তার রক্ত-ঝরে-পড়া
ঐ উপহার আজ জন্মদিনে এই পঞ্চাশ বছরে।

জয় গোস্বামীর কবিতা

মল্লিনাথ গুপ্ত

তরুণ প্রজন্মের কবিদের মধ্যে জয় গোস্বামী যথেষ্ট পরিচিতি অর্জন করেছেন। তার রচনায় একটি অন্তর্লীন রহস্যময়তা প্রথম থেকেই তাকে বিশিষ্ট করেছে। তরুণ কবিদের রচনায় যে গুণটি প্রায়শই অলক্ষ্য থাকে, সেই মিতকথন, ছন্দমনস্কতা, ক্লাসিকসংশ্লেষ—প্রথম থেকেই তার কবিতায় বর্তমান। যত দিন যাচ্ছে তিনি পরিণত হচ্ছেন। যদিও অত্যন্ত হালের কিছু কিছু রচনার পাঠযোগ্যতা কমে গেছে। হয়ে উঠেছে কর্কশ এমনকি দু-একটাতো প্রায় দুর্বোধ্যতার সমার্থকও হয়েছে। তবু সেখানেও কিছু কিছু পংক্তিতে তাঁর অম্লান কবিত্বভাব হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে উঠে পাঠকের খেদকে করেছে ক্ষণস্থায়ী। সেখানেই জয় উঠেছেন হয়ে জয়ী।

জয়ের কবিতা এর আগেও বিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতায় জয়ের মতো সিদ্ধি তার বয়সী আর কোনো কবি অর্জন করতে পেরেছেন কিনা জানিনা। তবে আমরাতো জানিই দীর্ঘ কবিতাই হচ্ছে সেই অন্তিম নিরিখ যেখানে প্রকৃত কবির কব্জির জোর যাচাই হয়।

আমরা শুনেছি এক প্রবহমান রুগ্নতা কবি জীবনের সুরু থেকেই তাকে ঘিরে রেখেছে। কোনো অর্থেই শারীরিক সুস্থতা বলতে কি বোঝায় সেই আনন্দ জয়ের জীবনে তেমন সত্য হয়ে ওঠেনি। অথচ

সেই গ্লানি কখনো স্পর্শ করেনি তার রচনাকে। যদিও এই ধারাবাহিক দেহজ অস্বস্তি তাকে হয়তো কখনো করেছে অতিরিক্ত বিরক্ত, কখনো বা কাপালিকের মতো সৌজন্যহীন শ্মশানবিলাসী। শব্দের আসব হয়েছে শব, অকাব্যিক শব্দ, কঠোর কবিত্বহীন পংক্তিদের প্রায় বর্জনসম্ভব প্রান্তে এনেই অকস্মাৎ তীব্র ধাক্কার মতো তার মধ্যে বসাতে পেরেছেন বীণার নিক্কন, রচনা মুহূর্তেই যেন হয়ে উঠেছে কবিতা। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এটা জয়ের এক সাম্প্রতিক খেলা। পাঠককে শংকিত, উৎকণ্ঠিত, ও প্রায় বিরক্তির প্রান্তে এনে অকস্মাৎ বাজিয়ে দেওয়া বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী। অর্থাৎ "কবিতা কি, আমি ঠিকই জানি—হে পাঠক আমি শুধু আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করছিলাম।"

জয়ের ওপর আমাদেরও গভীর বিশ্বাস।

জয় গোস্বামীর দীর্ঘ কবিতা

কবন্ধ বিবাহ

[কবে সে কবেকার কথা তো মনে নেই একবছর না কি দু বছর
এক জীবন না কি জন্ম দুই তিন (যায় সে জন্মেরও আগে যায়)
সর্বমঙ্গলা রক্তমঙ্গলা মূত্রমঙ্গলা দেবী হে
গুহ্যে বাস ছিল, বক্ষে উঠে এলে—তোমার সঙ্গেই বিবাহ :

ও সে কী অনুভূতি কী দাহ জ্বলে দেহ এ দুই স্ত্রীপুরুষ উভচর
হোক রে পেট থেকে সর্প হোক তোর ষণ্ড হোক এই
দিলাম বিষ ঢেলে দিচ্ছি এই ওহো মরে যাই
তোমার মুখ থেকে ষণ্ড জন্মাক আমার মুখ থেকে শিবা হোক !]

মাথাকে কেটে দেবো পায়ে, ও পায়ে, নিরুপায়ে
মাথায় ফোলে শিবা, ও শিবা লহুভারানত
ক্ষুৎপিপাসা ভোলো জন্মদেবী ওকে দিবি যে খাবে কী উপায়ে
লেখে যে কালি কই ? না লিখো কালো কথা মা লিখো লিখো শত শত

তোমাকে দেবো ভাসিয়ে দেবো এসেছি গঙ্গায়
গন্ধে ছিঁড়ি ছন্দে খাই রক্তহাড়মাস
লুপ্ত হয়ে যাবার আগে তোমার সংজ্ঞায়
ঢুকুক জল ঢুকুক তবে নিভুক নিঃশ্বাস

মা লিখো না লিখো না, লিখন জলে শ্যামা রক্তজিভে তোর কী লেখা
হ্যাঁ মা, ও কে ঘুমোয় ? ও ঘুম, ঘুম, আমি তোমাকে পাবো গাঁজা চরসে
এক পা তুলে জাগে ষণ্ড শিরে খায় আকাশ থেকে তারা গিলে খায়
শৃঙ্গে গাঁথা মেঘ, শ্যাম রে তুঁহু মম—উহু কী ঘন দেয়া বরষায়

না আমি ষণ্ড না, তীর্থভূমিপদে হা হা রে হি হি আমি পাগলা
জলে কী কেশভার ভাসে রে ভেসে যায় শিবা যে আমি দিবানিশিতে
এলো রে এলো বেগ অন্তে ফোলে জল—কে আছো ধরো মোরে আগলাও
ছাড়ছি, ছাড়ি এই মূত্রে ভাসো ওহো মুক্তি ভাসো দশদিশিতে

পেটের মাটি বুকের মাটি মাংসমদরুটি
খেয়েই বড় হলাম, আমি গোলাম নই তোর
দুদিন বাদে অসুখে পড়ি দুদিন বাদে উঠি
এখানে খুন ওখানে লাশ দুদিন অন্তর

হেই লাগো লাগো ভেলকী লাগোরে ভেলকী লাগো এ ধরণীতলে
তোমাকে ধরবো জ্যান্ত ধরছি জ্যান্ত ছাড়ছি মুর্দা ব'লে
মুখে মলভার ঠেলে ওঠে শূল ঠেলে ঢুকে যায় মলদ্বারে
সদরবাজারে দেহ পাওয়া যায় মুণ্ড লুটোয় খালের ধারে
হেই লাগো লাগো ভেলকী লাগোরে লাগাও ভেলকী ও ভানুমতী
ঠ্যাং নেই হাতা উড়ে গেছে এলো তোর দ্বারে ওই শ্মশানপতি
আদিকবি উনি আমরা তো শুনি ওঁর আবির্ভাব ব্রহ্মান্দিরে
উনি একাই তো নারী ও পুরুষ (কোন্ মামা তোর কোন্ মাসি রে ?)
ই কী অবস্থা ভিরমি খাচ্ছে ভয়ে পালাচ্ছে বাপদাদারা
মুখ দিয়ে ওঁর পিত্ত ঝরছে পায়ুপথে বয় প্রলাপধারা

লাগ ভেলকী লাগ ভেলকী শ্বশুরবাড়ি যাবা ?
লাগ ভেলকী লাগ ভেলকী লেড়কি বোকা হাবা
ভাগ লেড়কি ভাগ লেড়কি অসুরঘর থেকে
জাগ লেড়কি আগ লেড়কি কেরোসিনের চিতা

সদরে বাজারে রয়েছে হাঁ ক'রে ওরে ভানুমতী জগৎসভা
গলায় ঢোলক বাঁধবি কখন খুলবি বুকের রক্তজব ?
জবার রক্ত ফেটে গলগল দুধ পড়ে দুধ বিস্ফোরিত
দ্রিম-তাকে-দ্রিম আয় কাছে আয় গর্ভের ডিম ফাটিয়ে দি তোর
দুগ্ধধবল ফুটন্ত জল ধাইছে তরল মন্ত্রবলে
ভাসছে ডুবছে জলছে মাংস
কে কার শিশুকে ঝলসে আনছো
যে আনছে তাকে চিনে রাখ্ তার লিঙ্গ উপড়ে ফেলে দে জলে
লেগেছে ভেলকী লেগেছে ভেলকী জেগেছে ভেলকী ধরণীতলে···

তবু পৃথিবীতে জন্মেছো এই বিস্ময়ভরা ধরণী
তুমি কি কখনো প্রণয়গন্ধ বলে আনন্দ করোনি
শরীরে অরণি রাখোনি কখনো ? তবে অনুতাপ
ছেড়ে দাও, শোনো,
মাঝ গঙ্গায় যে ডোবাতে পারে চাও সেই খোলা তরণী

আমার মন বলে চাই চাই গো আমার
মন বলে চাই চাই
নয়ন মেলে দেখবো আমার তেমন শক্তি নাই
ভয় করে ভয় চতুর্দিকে ভাই বন্ধু ভাই
শ্মশান ভরে মাটি কোপায় মানুষ কোপায় মানুষ কোপায়
মা কোথায় মা গেল কোথায়
আমায় কে পায় আমায় কে পায় এ দেশ কে পায় ব'লে
পশ্চিমে সে রক্ত তোলে, পূর্বে তোলে ছাই
ছাইভস্ম ছাই রক্ত ওঁ রক্তছাই।

রক্তে-জল ভস্মে-মলে পিণ্ডে সব এক
মূত্র রসে পিত্ত-কফে পিণ্ডে সব এক
কাদার-মলে-মূত্রে-কফে-পিণ্ডে এ্যাক্, থু :

ন্যাখ্রে কত শক্ত হা হা শক্ত আহা শক্ত আমি ন্যাখ্ !

তাহলে তোরা ক'ভাই বোন ? আগুন বায়ু জল আমরা তিন
শরীর নিতে যাস্ কখন ? যখন দেখি শেষ হয়েছে দিন
কেউ কি তোদের আদেশ দিচ্ছে ? কেউ না, এই উপত্যকায় সবাই শুধু মুহূর্ত খায়
আহার শেষে আমরা আসি ঘুমন্ত প্রাণ নিতে
আরম্ভে যা, শেষেও কি তাই ? তাহলে কেন শেষ দৃশ্যে রক্তে তোদের
খড়ম ভেজা ?
তোরাই তবে ঘাতক শুধু পোষাক পুরোহিতের !

তবে প্রাণের সংজ্ঞা শোন্ : ঘুমিয়ে ঘুমসমুদ্রের তলে
জলের থেকে মাথা তুললি—জবাকুসুমসঙ্কাশং—অর্ধোশরীর জলে
আর্ধোশরীর মৎসপাখি, আর্ধোশরীর জন্তুডানা, আরো শরীর বৃক্ষ-লতা-কীট
কখনো তুই শূন্যে থাকিস, কখনো গায়ে চক্র আঁকা। কখনো কাঁটাখোলস ঢাকা পিঠ
কী ভূত ? কী বা পূর্বকথা ?—ষণ্ডশিবাসর্পনরজন্ম যায় যত
তত জীবন কৃতজ্ঞতা—মা লিখে বলো না লিখে বলো মা শত শত

আমার মা-কে দেখিস তোরা আগুন বায়ু জল
নিজের মা-কে দেখিস সব সবার ছেলেমেয়ে
আমার ভাঙ্গা শরীর, মাটি সবার দোষ নেয়
আমার নেবে ? আমার নেবে ? মাটির মানুষ আমি
দুহাত নোলা উদর ফোলা ছোবল নেই তাই
মাটির মানুষ আমি তোদের কোমরভাঙ্গা ভাই

দশদিনের সৌরবিষে দশদিনের গরল জ্যোৎস্নায়
ঘুমিয়ে পড়ি ঘুমিয়ে উঠি বাতাসহারা বায়ুসনের প'রে
নির্জলা ও শূন্যজলে মায়ের নামে অন্ন ফেলি
আধসিদ্ধ অন্নফেলি, বস্ত্রখণ্ডতোখণ্ড ফেলি

শয্যাকুশকাণ্ড ফেলি, ফেলিরে আমি
কাদার দলা মেদিনী ফেলে যাই…

পিণ্ড দেবো আমি মা-কে, ও মা-কে, পরমাকে
ভাতকাপড় দেবো দেবো না ভূমি তুমি কোথা রে শির কোথা রাখি
মুণ্ডু কোথা ওর ? মুণ্ডু নেই, ওরে নেই তো খাবো কী উপায়ে
কী খাবে খাবে কী ও ? পারো তো ধ'রে খাও সূর্যতারাসাত পাখি
খোলা গলায় ধরো সা ধরো পা ধরো হে মা ধরো মা-কে পরমাকে
বিবাহ দাও নিজ সঙ্গে দেহ দাও অঙ্গে যাও ওহো মিশে যাও

অঙ্গ যাও অঙ্গ যাক
পিণ্ড দাও পিণ্ড যাক
অন্ধকারে পিণ্ডজ্ঞান দিগ্বিদিক্‌হারা
ছিট্‌কে ওঠ্‌ ছিট্‌কে রস
পিণ্ড এক পিণ্ড দশ
সূর্যশূল ফিনকি দিক গর্ভে দিক ধারা
পিণ্ড পাক জন্ম পাক
পশুমানব বৃক্ষ বীজ
জলছে দুধ শুভ্র দুধ তারাসাগর তারা

আসতে দাও একে আসতে দাও তাকে যাকে ও তাকে মরা মা-কে
কী ঘুম ঘুমিয়েছি ও ঘুম খাবো তোকে কাঁচাই খাবো, খাবো, খাই
শূন্যে ছুঁড়ি এই পিণ্ড কালো মাথা দশটা মাথা খোঁজো মা-কে
লোফো তো লোফো দেখি একটা দুটো চাঁদ সাতটা চাঁদ সাতপাকে…

পুনর্বিবেচনা

শেষের হেলিয়োট্রোপ মণীন্দ্রলাল

শর্মিলা বসু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ'—এ বলেছিলেন : "সে-সব দিনে দু'জন লেখক আমাদের অভিভূত করেছিল—গল্পে উপন্যাসে মণীন্দ্রলাল বসু আর কবিতায় সুধীরকুমার চৌধুরী। কাউকে তখনো চোখে দেখিনি, এবং এঁদেরকে সত্যি-সত্যি চোখে দেখা যায় এ-ও যেন প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল।" ইনি হলেন সেই 'রমলা'র বিখ্যাত লেখক—যে রমলা দিনের পর দিন কৈশোরোত্তীর্ণ যৌবনের প্রান্তোপনীত প্রতিটি তরুণহৃদয়কে আপ্লুত করে রাখতো। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন এই অদ্ভুত অনুভূতির কথা—"পড়ছিলুম মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'। আমাদের সেই বয়সে উপন্যাসটা কি যে অদ্ভুত ভালো লাগত। আমাদের সব রঙ সব নেশা যেন বইটার পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছিল। সেই হাজারীবাগের পথ, সেই হেলিয়োট্রোপ রঙের শাড়িপরা মেয়েটি, সেই ওমর খৈয়ামের রুবাই।" অথচ, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর মাত্র চারটি উপন্যাস আর পাঁচটি ছোটগল্পের সংকলন। এছাড়া কিছু অগ্রন্থিত ছোটগল্প, একটি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস, শিশু ও কিশোর সাহিত্যের কিছু সম্ভার, ইতস্তত ভ্রমণকাহিনী অনুবাদকর্ম এই তাঁর সাহিত্যসাধনার ফসল। কিন্তু আজও যাটোর্ধ্ব প্রায় প্রতিটি বাংলাসাহিত্যের পাঠক রমলা বলতে শিহরিত হয়ে ওঠেন।

কি সেই চাবিকাঠি যা মণীন্দ্রলালকে এমন জনপ্রিয় করে তুলেছিলো ? কি-ই বা সেই মূল্যায়নবোধ যা আজও তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনায় এমন অপরিহার্য করে রেখেছে ? এইসব প্রশ্নের মীমাংসায় যাওয়ার আগে আমরা চট্

ক'রে একবার দেখে নিতে পারি রমলা প্রকাশের সমকালীন (১৯২৩) বাংলা সাহিত্যের গোটা চেহারাটার কথা। তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অসীম আধিপত্যে সমাসীন, জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আছেন শরৎচন্দ্র; আর এঁদেরই পাশাপাশি আছে প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধির চমক এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়াবেগে ভরপুর ছোটগল্পগুলি[১]। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে মণীন্দ্রলালের আবির্ভাব—এক অসাধারণ রোমান্টিক উন্মাদনা—যার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পাঠক বাঙালির কোনো পরিচয় ছিলো না। যৌবনের বেদনা যৌবনের উচ্ছলতা তার রঙীন মাধুর্যে শতমুখী বিচ্ছুরণ নিয়ে প্রকাশরূপ লাভ করলো মণীন্দ্রলালের কলমে। যৌথ পরিবারকেন্দ্রিক গ্রামীণ বাঙালির সেন্টিমেন্টে ভরপুর জীবননাট্য নয়, অথচ আবেগে চঞ্চল, জীবনে মেতে-ওঠা যৌবনদিনের আলেখ্য। মণীন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ তো করলেনই না কোনোভাবে, বরং এক জায়গায় অতিক্রমণ করে পদচিহ্নের দৃঢ়-প্রত্যয়ীরূপ ফুটিয়ে তুললেন নিজস্ব সরণিতে।

অথচ তখন কতোই বা বয়স মণীন্দ্রলালের! ১৩২৬ এর শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে যখন মণীন্দ্রলালের প্রথম গল্প 'অরুণ' বেরুল, তখন মণীন্দ্রলালের বয়স মাত্র বাইশ-তেইশ বছর। ১৩২৬-এর প্রবাসী গল্প প্রতিযোগিতায় অরুণ গল্পটির জন্য লেখক প্রথম পুরস্কার পান। এই গল্প প্রতিযোগিতায় সে'বছর দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন সুধীরকুমার চৌধুরী 'বাহুড়' গল্পটি লিখে এবং তৃতীয় পুরস্কারটি পান 'স্বরণা' সম্পাদক প্রভাকর দাস তাঁর 'প্রদীপ' গল্পটির জন্য।

প্রথম গল্প অরুণ এ-ই মণীন্দ্রলালের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছিল। এক অদ্ভুত বেদনাবোধ, যা দূরের, যা অপ্রাপণীয় তার জন্যে ব্যথা—এই ছিল মণীন্দ্রলালের সাহিত্যভাবনার কেন্দ্রীয় আলম্বন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর / তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি···"। সেই বাঁশির ধ্বনিই যেন মণীন্দ্রলালের শিল্পপ্রবণ ভাববিলাসী অন্তরের আর্তি জাগাতো ওই দূরকে পাবার জন্য। ইংরেজি সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় Romantic agony। সুদূরের প্রতি এই অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা ও বেদনা—এ রোম্যান্টিসিজমের লক্ষণ। সেই বাইবেলের মীথের সময় থেকে নর এবং নারী—এরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়িয়েছে—পাওয়া-না-পাওয়ার যন্ত্রণায় বারবার মথিত হয়েছে আর তাদের সেই বেদনামন্থনেই জন্ম নিয়েছে সৃষ্টি, বিপুল রহস্য।

বাংলা সাহিত্যে মণীন্দ্রলালরা এক নব্য রোম্যান্টিকতার ধারক। বঙ্কিমের সাহিত্যের রোম্যান্সরস রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-উত্তর কথাসাহিত্যধারায়

নবপ্রেরণালব্ধ জীবনবীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছিলো। প্রমথ চৌধুরীর শানিত বৈদগ্ধ্যের আড়ালেও তথাপি ছিলো এক সৌন্দর্য-অনুসন্ধান।[২] মণীন্দ্রলালেরা যে নব্য রোম্যান্টিকতার ধারক তার মূলে কিন্তু জার্মান রোম্যান্টিসিজমের কোনো প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গ ছিলো না। জার্মান রোম্যান্টিসিজম-এর মূল সুর অজানার প্রতি টান—তার সঙ্গে এক অতিলৌকিক, গা-ছমছমে আবহ—যেখানে এক সৌন্দর্য ও আনন্দ লীন হয়ে আছে। পক্ষান্তরে, ফরাসী রোম্যান্টিসিজমের উদ্দীপক বিভাব সৌন্দর্যবিলাস বা ভোগবিলাস—এখানে রয়েছে সৌন্দর্যময় পারিপার্শ্বকে সরিয়ে এক অদ্ভুত করুণমাখা আবেগ; এর প্রকাশ ভিক্টর হুগোর রচনায়। এই দুই ধারার কোনোটিরই প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলার নব্য রোম্যান্টিকদের উপর নেই। এঁরা বিভাবিত হলেন ইংরেজি Romantic agony-র দ্বারা। এঁদের সাহিত্যে সুদূর অন্বেষণ, মৃত্যুময় নিরাশা থাকলেও তা-ই প্রধান কথা নয়—রোম্যান্টিক ভোগবিলাসও কখনোই প্রধান নয়। অথচ এঁরা সুদূরের পিয়াসী, এঁরা জীবনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নবীন বিভায় দেখতে চান।

মণীন্দ্রলালের প্রথম গল্প অরুণ-এ রোম্যান্টিকতার নবীন বাতাবরণ। বাংলা সাহিত্যে এক আন্তর্জাতিক অবয়ব পাচ্ছে এই সময়ে। দিলীপকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু এবং অন্নদাশঙ্কর এই আন্তর্জাতিকতার প্রথম পথিকৃৎ। এক বিশ্ববীক্ষা এসে যুক্ত হচ্ছে এঁদের জীবনায়নে। মণীন্দ্রলালের নায়ক অরুণ তাই পথিক—এক বিশ্বপথিক। তার চুচোখে দেখার তৃষ্ণা। সে দেখতে চায় সাম্প্রতিককে নয়, সমকালের মধ্যে ফেলে আসা কালকে, চিরকালের আভাসকে—"আমেরিকার নগরে নগরে যখন ঘুরেছিলুম তখন মনে হয়েছিল গারদখানা দেখে বেড়াচ্ছি,—সেখানে হাজারে হাজারে মানুষ মিলেছে বেচাকেনার জন্যে, লোহার কল ঘুরছে, চিম্‌নীর ধোঁয়া উঠছে, পায়রার খোপের মত ত্রিশ-চল্লিশতলা বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিকের আলো আর হাওয়ায় মানুষ বেঁচে আছে; নগরলক্ষ্মী স্বর্ণপদ্মে ডলার-পাপড়ির ওপর তাঁর কোটিপতি বরপুত্রদের নিয়ে বসে আছেন। মানব সভ্যতা এক বিশ্বরূপ নিয়েছে, তাই জীবনযাত্রা ঘর-বাড়ী সব দেশে এক হয়ে যাচ্ছে; বিচিত্রতার জন্যে আমার চিত্ত পিপাসিত হয়ে ওঠে। প্যারিসেও এই নব সভ্যতার রূপ দেখেছি—তবুও ইয়োরোপের সভ্যতার পর্বে পর্বে যে নব নব স্রোত প্রবাহিত হয়েছে তারই ইতিহাস এখানকার ইঁট পাথরে লেখা রয়েছে। মধ্যযুগে এই নগরী ইয়োরোপের আথেন্স ছিল, এরই বুকে ফরাসীবিপ্লবের রক্ত গঙ্গায় স্নান করে বর্ত্তমান সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে; নেপোলিয়নের জয়পরাজয়ের

ইতিহাস এরই সঙ্গে জড়ান। আমি হুগোর প্যারিস, বালজাকের প্যারিস, ইউকি-মুর প্যারিস দেখতে চাই—এ বিংশ শতাব্দীর প্যারিস নয়।" অদ্ভুত তার জীবনদর্শন: "লোকে ভালবাসে বলেই মেলে, আমি ভালবেসেছি বলেই মিলিনি···"। এই বিশ্বপথিক অরুণ আবার বিপ্লবীও বটে। তবে তার বিপ্লব এক অর্থে নতুনের আবাহন, চিরাচরিতের বিনাশ: "আমার রক্তে যৌবনের আগুন জ্বলছে—যা পুরাতন ভাঙ্‌তে চায়, নতুন সৃষ্টি করতে চায়, মানব-সভ্যতার নব নব রূপ দেখ্‌তে চায়—এই ত বিপ্লব—পুরাতনকে ভেঙে নতুন করে গড়ার নামই ত বিপ্লব।"

স্বর্ণসভ্যতার প্রতি মণীন্দ্রলালের আকণ্ঠ বিতৃষ্ণা। পরবর্তী গল্প 'জন্ম-জন্মান্তর'-এ (ফাল্গুন, ১৩২৭/প্রবাসী) নায়ক তরুণ এক নারীর মধ্যে বিশ্বনারীকে দেখতে চেয়েছে কিংবা তার সমগ্র বিশ্বসন্দর্শন সমীকৃত বা সমাহিত হয়ে গেছে প্রেমিকা বেলা-র মধ্যে এসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সে ঘুরে বেড়িয়েছে নানা দেশে নানান নারী সংস্পর্শে ও ঘনিষ্ঠতায় সে উপনীত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত জন্মান্তরই রূপায়িত পরিণতি লাভ করেছে বেলা-তে এসে। একই জন্মে সে স্পর্শ করেছে জন্ম-জন্মান্তর নিত্যনবায়মান জীবনস্পন্দনকে। রবীন্দ্রনাথ আর বিদ্যাপতির উচ্চারণকে আত্মমুখী করে নিয়ে তরুণের অনুভব গাঢ়ত্ব লাভ করেছে, জীবন সুষমায় আর উপলব্ধিতে একই জন্মের মধ্যে বিভিন্ন জন্মের আনন্দকে আত্মসাৎ করেছে তরুণ: "এম্নি করিয়া জন্মে জন্মে যুগে যুগে তাহারা দুইজনে ভালোবাসিয়া আসিয়াছে, জগতের কোটি প্রেমিকদের মধ্যে তাহাদের অনন্ত প্রেমের লীলা কি অপরূপ কি অনির্ব্বচনীয়। অনন্ত জন্ম ধরিয়া তরুণ বেলার রূপ দেখিয়া আসিয়াছে তবু তাহার আঁখি তৃপ্ত হইল না, লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়া রহিল তবু হিয়া জুড়ান গেল না।" তাই বেলার কোন দেশকালসাপেক্ষ পরিচিতি তরুণের কাছে বড়ো নয়—তরুণ এক বিশ্বনাগরিক, এক সর্বাত্মক বিশ্ববোধে উদ্দীপিত প্রাণ: "কে? বেলা? না—না—বাংলা বলিয়া কোন দেশ নাই, সেখানে হিন্দুসমাজ বলিয়া কোন কারাগার নাই, তার মধ্যে বেলা বলিয়া কোন সোনার খাঁচায় বন্দিনী নাই।" তরুণের এই বিশ্বসত্তার মধ্যেও অন্তর্নিহিত হয়ে আছে চিরসুদূরপিপাসু চিত্ত। তাই সে তার অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে দূরের ডাককে অনুভব করছে—তার বিশ্বপরিক্রমা আত্মতাগিদের নিগূঢ় আবেদনে স্পন্দিত: "সুদূর যে কেমন করে ডাক দিতে পারে তা রক্তের প্রতি-কণা দিয়ে অনুভব করছি। পৃথিবী আমায় ডাক দিয়েছে, তোমাদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। আজ অন্তরে যেন সপ্ত-সাগরে ঊর্ম্মি-উন্মাদনা জেগেছে। এ কিসের তৃষ্ণা? কিসের কান্না? এ গোপন রহস্য-ময় নিবিড় বেদনা যেন অর্দ্ধেক আমার সুদূর-পিয়াসী মনের সৃষ্টি আর অর্দ্ধেক এই বাহিরের জল স্থল আকাশের মায়া, আমার বেদনার মেঘমেদুর অন্তরে জগতের চিরন্তন বক্ষ তার বিরহিণী প্রিয়ার সন্ধানে বাহির হয়েছে।—"যে অনন্ত বিরহ রোম্যান্টিকতার উদ্দীপন তারই তাড়নায় তরুণ ঘরছাড়া, দেশছাড়া। দেশে দেশে সে যতো ঘুরেছে একই সঙ্গে সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে, যন্ত্রসভ্যতা, স্বর্ণ-লালসা তাকে আশঙ্কিত করেছে। "কি অন্তহীন আনন্দে বিশ্বশিল্পী নারীর অঙ্গ গড়িয়াছে তাহা সে বুঝিল। চরণে তাহার বাতাসের নৃত্য, চরণে তাহার ধরণীর স্থিরতা, নয়নে তাহার অগ্নির দীপ্তি, নয়নে তাহার সলিলের স্নিগ্ধতা, আননে তাহার অরুণের দ্যুতি, আননে তাহার অমানিশার তিমির, হস্তে তাহার মুঠাভাণ্ড, হস্তে তাহার রক্তস্নাত খড়্গ, কণ্ঠে তাহার শুভ্র মিলনমাল্য, কণ্ঠে তাহার নরমুণ্ড-মালা, কেশ তাহার অরুণ-কিরণধারা, কেশ তাহার শ্রাবণমেঘঘন, বক্ষ তাহার স্নিগ্ধ যমুনাজল, বক্ষ তাহার অগ্নিকুণ্ড। নদীর গতি দিয়া ঢেউয়ের ছন্দ দিয়া ফুলের গন্ধ দিয়া বসন্তের আনন্দ দিয়া তাহার তনুর সৃষ্টি; রক্তের রসধারায় ঊষার স্বপ্ন দিয়া মানব অন্তরে প্রেমপদ্ম ফুটিয়াছে; ধূলি মাটি জল হাওয়া অগ্নি তরু-তৃণের সহিত মিলাইয়া ফুলের সহিত তারার সহিত গাঁথিয়া মানব আত্মার আনন্দ দিয়া বিশ্বকবি নারীর অন্তর গড়িয়াছে—এ প্রেমের পুণ্যতীর্থ, প্রাণের চিরলীলাভবন নব নব জীবনের জন্মনিকেতন, অগণিত মানবযাত্রীর সঙ্গীতমুখরিত অনুপম মায়াপথ?" পরস্পর বিপরীত উপমার মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের পরিপূর্ণ সামগ্রিকতার আভাসই সম্ভবত দিতে চেয়েছেন। নারী তথা জীবন সৌন্দর্যের বৈপরীত্যে আছে স্বর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রায়নের বীভৎস চেহারার কথা—"আমি বিস্ময়ে বলে উঠ্‌লুম, রক্তের রং কালো কেন? তুমি বললে, জগতের কয়লার খনিতে, লোহার কারখানায়, লক্ষ লক্ষ কলে যারা চিম্‌নির ধোঁয়া খেয়ে মরেছে, এ তাদেরই রক্ত—কল্-দৈত্যের লোহার মন্দিরে যাদের বলি হয়েছে, এ তাদেরই রক্ত।" "তুমি বললে, দেখ্‌ছ তরীটা সোনার হয়ে গেছে, হালের কাছে এক সোনার নরকঙ্কাল বসে, তার হাড়ে-হাড়ে মণি-মুক্তা বসানো, হীরার মত চোখ-দুটো জ্বল্‌ছে, আর বিপুল বিরাট হাঁ, যেন আকাশটা গিলতে চায়—এও যে রক্তের সাগর! আমার দেহ-মন শিউরে উঠ্‌ল সেই সোনার নৌকার হিম-স্পর্শ যেন জালাভরা! তুমি বললে স্বর্ণ-পূজারীদের এই রক্ত! সোনার পেছনে যারা

ছুটেছে—সোনার লোভে যারা ভাইকে মেরেছে, স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে—আপন পুত্রকন্যাকে বেচেছে—আপন শিশু-সন্তানদের বলি দিয়েছে—এ তাদেরই রক্ত ! চোখ ছুটো যেন সোনা হয়ে যাচ্ছে—সোনা—সোনা—চারদিকে হলুদে সোনা !" তখনও প্রকাশিত হয়নি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। তাই বলা যেতে পারে, মণীন্দ্রলাল নিশ্চয়ই প্রভাবিত ছিলেন না রক্তকরবীর এই সংলাপ অংশের দ্বারা—

অধ্যাপক।···আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা।···

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা-যে এই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

বা—

···গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণ লাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না।···

২

মণীন্দ্রলাল বসু নিজে বলেছিলেন, "রমলা এক সময় অনেকের দৃষ্টি টেনেছিল ঠিকই, কিন্তু কেবল রমলা দিয়ে আমার সাহিত্যের বিচার করবেন না। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তা এই ছোট গল্পগুলিতেই পাবেন।" তথাপি বাংলা সাহিত্যের আলোচক-গবেষকদের কাছে মণীন্দ্রলালের মূল স্বীকৃতি 'রমলা'র লেখক হিসেবেই। উপন্যাসটি ১৩২৯-৩০ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৩০ সালের আশ্বিনে এটি-র গ্রন্থরূপে প্রকাশ। রমলা পাঠকমনে যে প্রভাব ফেলেছিলো তার একটা স্থায়ী মূল্য আছে। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রমলা সম্পর্কে বলেছিলেন : "মণীন্দ্রলালের রমলা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মণীন্দ্রলাল

বড় মিঠা হাতে কবিত্ব সরস ভাষায় গল্প লিখেন, এই উপন্যাসে তিনি নিছক কবিপনা ও নিছক অর্থোপাসনার ব্যর্থতা দেখাইয়া উভয়ের সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্যেই যে প্রকৃত সাংসারিক সুখ তাহাই নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন।" 'রমলা' সেদিন কতোদূর পাঠককে আবেগী করে তুলেছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা থেকে তা বোঝা যাবে—"যেদিন 'রমলা'কে নিয়ে বঙ্গমহাশয় বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন, মনে আছে সেদিন কি উৎসুক আনন্দে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম··· তাঁর গল্পের মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন ডাচ চিত্রকরদের মতন প্রচুর রঙ·· য়ুরোপ আর ভারতের নানান কালচারের রঙিন ফুলে ভরে উঠলো তাঁর ভাষার বাগান··· সৌন্দর্যের স্বপ্নে, কবিতার রসে, জীবনের রঙে ঝলমল করে উঠলো একটা বেগবতী আকাঙ্ক্ষা · তারুণ্যের আত্মবিলাস···"।

'রমলা'য় পাশাপাশি দুটি কাহিনী। একটি রজত-রমলার, আরেকটি যতীন-মাধবীর। একটি কাহিতে প্রেম থেকে আনন্দে, জীবন থেকে জীবনশিল্পে উত্তরণ; আরেকটিতে অর্থবাসনাময় প্রেমহীনতা থেকে কল্যাণস্নিগ্ধ যৌথতার পথাতিক্রমণ। বলা বাহুল্য, প্রথম পথপরিক্রমা রজত-রমলার, দ্বিতীয়টি যতীন-মাধবীর আর এই দুটি পারস্পরিক সমান্তরাল কাহিনীকে গেঁথে রেখেছে বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র ও তাঁর অতৃপ্ত জীবনরাগ, কাজীসাহেব ও তাঁর কবিতা। রজত-রমলার সম্পর্ককে আনন্দময় করেছে বন্ধু ললিত, মামাবাবু ও তাঁর বিচিত্র খেয়াল। যতীন-মাধবীর সম্পর্কের মধ্যে অস্পষ্ট তৃতীয় চরিত্র হিসেবে এসে পড়েছে শচী।

'রক্তের মত রাঙা লালমাটির পথ'-এর কথা দিয়ে উপন্যাস শুরু। উপন্যাসটির কাহিনীবৃত্ত পরিসমাপ্তিতে পৌঁছেছে সেই 'রক্তের মত রাঙা লালমাটির পথ' এবং তার 'সুদূর হাতছানি'র কথা দিয়ে। উপসংহারে আছে রজতের ডায়েরির একটি অংশ। প্রবাসীতে প্রকাশের সময়ে প্রিয়াবিরহী যতীনকে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছিলো। অর্থাৎ মাধবীর মৃত্যু সেখানে ছিলো উপন্যাসের ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। প্রবাসীতে প্রকাশের সময়ে উপন্যাসের শেষে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) সাঁইত্রিশতম পরিচ্ছেদে রজতের ডায়েরির অংশের পর আটত্রিশতম অধ্যায়ে ছিলো হাজারিবাগের বাড়ির ঘটনা—অর্থাৎ যোগেশচন্দ্রের সেই বাড়িতে যেখানে রজত, রমলা, মাধবী, যতীন এদের সম্পর্কের প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিলো সেখানে রজত এবং রমলার সপুত্রকন্যা প্রত্যাবর্তন, তাদের সুখী দাম্পত্যজীবনের কথা, কাজীসাহেবের জীবনের সমাসন্ন শেষের প্রহরের কাছাকাছি কিছু মুহূর্ত ও

উপলব্ধি ও একেবারে শেষে প্রিয়াহারা যতীন—এরাই ছিল উপন্যাসের শেষে। একেবারে শেষ অনুচ্ছেদটি ছিলো এই রকম—

"যতীন ধীরে উঠিল, ঘর ছাড়াইয়া, বারান্দা পার হইয়া রাজপথের দিকে চলিল। গেটের কাছে আসিয়া একেবারে বাড়ীখানির দিকে চাহিল। জ্যোৎস্নার আলোয় লাল বাড়ীখানি রূপকথার পুরীর মত, পিয়ানোর সুর পুষ্পগন্ধ-ভারাক্রান্ত বাতাসে মৃদু ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্রগীতমুখর জ্যোৎস্নালোকধৌত শান্তকুটীরাচ্ছন্ন মাধবী-দ্বীপের ছবি তাহার চোখে আবার ভাসিয়া উঠিল। পিয়ানো বাজানো শেষ করিয়া উঠিয়া রমলা আর কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।"

মুদ্রিত উপন্যাসে মাধবী মরেনি—যতীনের সঙ্গে মাধবী একই সঙ্গে মানব-কল্যাণকাজে আত্মনিয়োজিতা। সন্তানহীনা মাধবীর সমস্ত বুভুক্ষার অবসান ঘটিয়েছে সুন্দরবনের সেই শান্ত নির্জন দ্বীপটি—যেখানে সে আর যতীন মিলে গড়ে তুলেছে নব জনপদ। যে যন্ত্রদানবের মোহে যতীন একদিন ভুলেছিলো আজ তারই বীভৎসতাকে সে পরিবর্তিত করেছে মানবমঙ্গলে।—"দেশে ফিরিয়া আসিয়া যতীন তাহার কলকারখানা ও ব্যবসায়ীর জীবন একেবারে ছাড়ে নাই বটে, কিন্তু সে এক নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মত্ত হইয়াছে। সুন্দরবনে অনেক জমি কিনিয়া নূতন আদর্শে নূতন গ্রাম বসাইয়াছে, গঙ্গার মোহনার কাছে ছোট দ্বীপ লইয়া সেখানে পল্লীনগর প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহার দেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহুলোককে বিনামূল্যে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছে। এই দ্বীপটির নামকরণ মাধবীর নামে হইয়াছে। এইসব উদ্যোগে মাধবী তাহার বন্ধু, সহায়, শক্তি।" অর্থবাসনা আর যন্ত্রশক্তির উদ্দাম গতিবেগ একদিন মাধবী-যতীনের সম্পর্কের মধ্যে যে আড়াল এনেছিলো এই যৌথ কর্মপ্রেরণা আজ তাদের এক ক'রে দিয়েছে। মাধবী প্রেমহীনতার গ্লানিতে ভ্রান্ত জীবনবেগের পেছনে যে বৃথা ঘুরে মরছিল দিনের পর দিন, আজ তার সব শান্তি, সব আশ্রয় তারই নামাঙ্কিত দ্বীপটি, তার মানুষজনেরা—"…মাধবীর মুখে সমুদ্রগীতমুখর জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত শান্তকুটীরাচ্ছন্ন তাহার দ্বীপের ছবি বারবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চাষী মজুরদের পরিবারের শান্তিময় গৃহগুলিতে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বাঁশী বাজিতেছে, কোথাও সাঁওতালেরা নৃত্য শুরু করিয়াছে, কোথাও ছেলেমেয়েদের লইয়া মা গল্প বলিতেছেন। চাষী-মজুর ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া

উঠিল। শালবনের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া সে নবস্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল।" হয়তো মাধবীর অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণাকে মাঙ্গলিক পরিণামে পৌঁছে দিয়ে রমলার বিপ্রতীপে মাধবীকেও এক ধরণের সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই পত্রিকায় প্রকাশকালীন পরিণতিকে ঈষৎ পাল্টে নিয়ে লেখক এই ধরণের একটি সমাপ্তি অংশ রচনা করলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, 'রজতের ডায়েরি' অংশকে লেখক একেবারে শেষে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন কেন? মুদ্রিত সংস্করণের পাঠে (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৭) একই পথের বর্ণনা দিয়ে শুরু এবং শেষ করে লেখক উপন্যাসের কাহিনী-বৃত্তের একটি পথাতিক্রমণকে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। এ পর্যন্ত উপন্যাসের শৈলী-ভঙ্গিমাটি নৈর্ব্যক্তিক, বর্ণনাত্মক। উপন্যাসের শেষে রজতের ডায়েরি অংশ সম্পূর্ণই আত্মগত এবং মূল কাহিনীবৃত্তের সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন। এই অংশটির সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বাহ্য বিচারে উপন্যাসের গুরুত্ব বাড়ায় না। কিন্তু অন্তর্গত বিচারে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি রজতের এই মুগ্ধতাটুকুর মূল্য আছে। এতক্ষণ ধরে উপন্যাসে জীবনের যে বিচিত্র রঙ, রূপ, সৌন্দর্যের কথা বলা হ'লো রজতের মুগ্ধতা যেন তারই প্রতি। রজতকেই বিশেষভাবে বেছে নেবার কারণ রজতও শিল্পী। বিশ্বশিল্পকে সে অনুধাবন করতে পেরেছে তাৎপর্যমণ্ডিত করতে পেরেছে আত্মশিল্প দিয়ে—"বিশ্বলীলা কমল হাতে করিয়া কোন্ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তুমি হাসিতেছ। এ জ্যোৎস্নারাত্রে তোমার প্রসন্নমুখের হাসি দেখিয়া নয়ন মুগ্ধ সার্থক হইল। তোমার এই কোটি কোটি রূপের প্রদীপজ্বালা বিশ্বমন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া ধন্য হইলাম। বিশ্বশিল্পী তোমাকে নমস্কার!"

৩

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'য়ুরোপ আর ভারতের নানান কালচারের রঙিন ফুলে' ভরে ওঠা যে 'ভাষার বাগান'-এর কথা বলেছেন এবার একটু তার আলোচনায় আসা যাক্।

উপমা প্রসঙ্গে মণীন্দ্রলালের অসাধারণ দক্ষতা। রসেটির ছবি, হাফেজের কবিতা, নীলসমুদ্রের মতো অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মতো চঞ্চল, মূর্তিমতী পূর্ণিমা, মোনালিসার মুখের চিররহস্যময় আনন্দ-হাস্য বারবার বিভিন্ন বর্ণনায়, অনুষঙ্গে চলে আসে। এছাড়া তো আছেই কাজী সাহেবের মুখের উর্দু কবিতার ডালি। সৌন্দর্যবর্ণনায় মণীন্দ্রলালের চারুময় নৈপুণ্যের বিপুল

অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে নারীসৌন্দর্যের ব্যাপক ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্কিমের বর্ণনায় যে শিল্পপ্রেরণা, মণীন্দ্রলালেরও তাই। তবে মণীন্দ্রলাল হয়তো বঙ্কিমের পর পঞ্চাশোর্ধ বছর পার হয়ে আবির্ভূত বলে আরও বেশি আত্মস্থ এবং মগ্ন। তাঁর রোম্যান্টিকতার ভাব এবং ভাবাবেগ যেন বারবার বাকপ্রতিমা লাভ করেছে নারী আর প্রকৃতি—সৌন্দর্য জগতের এই দুই প্রান্তকে স্পর্শ ক'রে। ললিত রজতকে বলেছিলো, "যদি কোনো নারীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অনুভব করতে চাও, তার অন্তরের অপরূপ মায়ালোকে প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রথমে তাকে ভালবাসো।" মণীন্দ্রলালের জীবনদর্শনও তাই। ভালো না বাসলে এমন পাগলকরা উচ্ছ্বাসে কেউ কখনো সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে পারে না। প্রতিটি সৌন্দর্যবর্ণনায় মনে হয়েছে প্রেমিকের মতো, কবির মতো, চিত্রীর মতো আনন্দে, প্রেমে, মুগ্ধতায় তিনি তাঁর সাহিত্যলোকের নারীদের স্পর্শ ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন তারপর যোগ্য ভাস্করের মতো নিপুণভাবে নির্মাণ করেছেন তাঁর সৌন্দর্যপ্রতিমা। "নারী হৃদয়ের রহস্যলোক যে প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে প্রেমের প্রদীপ।" এই মায়াপ্রদীপেই লেখকের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছে তাঁর প্রতিটি নারীচরিত্রের।—"নারী হচ্ছে পুরুষের কাছে এক জীবন-জোড়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন, নীল সমুদ্রের মত অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মত চঞ্চল, ওদের সম্বন্ধে কোন থিওরি কোরো না, বুদ্ধি দিয়ে এ চিররহস্যময় যন্ত্রটিকে বুঝতে যেও না, পারবে না, প্রতিক্ষণে এর নব নব রূপ। প্রেমের সহিত স্পর্শ কর, যখন সে সুরে আঘাত করবে, তার যেমনই হোক ঝঙ্কার ঠিক পাবে। নারী সেতারকে বুঝতে যেও না, প্রেমের হাতে আনন্দে বাজাও!" রজতের দৃষ্টি দিয়ে লেখক এই দৃষ্টিপ্রদীপের আলোতে মাধবীকে আর রমলাকে—দুজনকেই দেখেছেন। একজনকে মনে হয়েছে অপূর্ব নির্মাণ, আরেকজনকে আনন্দিত সৃষ্টি—"বিশ্বশিল্পী দুইজনকেই সুন্দর করিয়া গড়িয়াছে বটে, কিন্তু একজনকে অতি আশ্চর্য কৌশলে গড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; আর একজনকে নিখুঁতভাবে গড়িলেও, গড়া তার শেষ হইতে চাহিতেছে না। মাধবী যেন কোন গ্রীক ভাস্করের গঠিত মূর্তি, তাহার যৌবনপুষ্পিত তনু বসন্তব্রততীর মত পরিপূর্ণ, কিন্তু টলমল করিতেছে না; তাহার দেহের বর্ণ স্থিরদামিনীর মত, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ প্রস্তরের শুভ্রতার মত; প্রতি অঙ্গ সুগঠিত, কোথাও সৌন্দর্যের রিক্ততা নাই, তাহার নাক চোখ ঠোঁট মুখ হিসাব করিয়া সাজানো, প্রতি অঙ্গের সহিত প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য, এ মূর্তিমতী পূর্ণিমা, মনকে মুগ্ধ করে বটে কিন্তু মত্ত করে না। আর

রমলাকে দেখিলে মনে হয়, এ শিল্পীর তুলিতে আঁকা সুন্দর ছবি; এ অনুকৃত শিল্প নয়, ভাবাত্মক; প্রতি অঙ্গভঙ্গী ভাবের ব্যঞ্জনায় ভরা, দেহের গঠনে বর্ণে সৌন্দর্য ফুরাইয়া যায় নাই, তাহার নাক চোখ মুখ একটু অসম ভাবেই গড়া, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য বাড়িয়াই গিয়াছে, চক্ষে গণ্ডে মাঝে মাঝে কিসের দীপ্তি ঝলসিয়া ওঠে, মুখের রং সব সময়ে একরকম থাকে না, কখনও পদ্ম পরাগের মত রাঙ্গা হয়, কখনও শুকনা গোলাপ পাতার মত কালো হয়, কখনও পলাশের মত জ্বলজ্বল করে; তাহার মনের ছন্দের মত তাহার দেহ লীলায়িত; সবচেয়ে সুন্দর তাহার সারঙ্গ নয়ন, কখনও হাসির আলো, কখনও স্বপ্নের মায়া, কখনও দীঘির কালো, কখনও মেঘের ছায়া,—তাহার চক্ষু তারকায় যে আলো জ্বলিতেছে তাহা সূর্যের নয়, তারার নয়, তাহা বিদ্যুতের, তাহার দিকে চাহিলে সমস্ত জগৎ প্রাণময় প্রেমময় হইয়া ওঠে।"

মণীন্দ্রলাল বসু তাঁর রমলায় যে জীবনের কথা বলেছেন তা প্রাত্যহিকতাদীর্ণ জীবন নয়। তিনি তাঁর সাহিত্যলোকে এক সৌন্দর্যময় অমরলোক তৈরি করতে চেয়েছেন যেখানকার চরিত্ররা বাস্তব থেকে উঠে এলেও বস্তুজাগতিক নয়। "মণীন্দ্রলালের রোম্যান্টিকমন সমকালীন জীবনের ভাঙাচোরা বিবর্ণ ধূসর রূপকে অতিক্রম ক'রে পূর্ণতা খুঁজে ফিরেছে, খুঁজেছে জীবনের রঙ, সৌন্দর্য ও সুর।··· মণীন্দ্রলালের কথাসাহিত্যের জগৎ এই রূপকথার স্বপ্নজগৎ, সৌন্দর্যলোক। চারদিকের সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির অন্তহীন ফেনিল সমুদ্রের মধ্যে মণীন্দ্রলাল যেন এক আশ্চর্য সুন্দর দ্বীপখণ্ড রচনা করেছেন। পাঠক সেই দ্বীপে প্রবেশ করে জীবনের দুঃখ ক্ষণকালের জন্যেও অন্তত বিস্মৃত হয়।" (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য: ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃ ২৩৭-৩৮)।

'রমলা'র পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি-দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক তাঁর পক্ষপাত ও সামঞ্জস্যের সীমাসাধন করেছেন। যেমন যতীন আর রজত—এই দুটি বন্ধু। যতীন যন্ত্রসভ্যতার উপাসক, রজত চিত্রশিল্পী। যতীন চায় গতি, আরও গতি; রজত মোটরের যুগেও পুলুপুস্ চড়ে পথ চলে, বাঁশিতে নেপালী সুর বাজিয়ে মনকে দ্রবিত করে তোলে। যতীন রমলাকে ভালো লাগলে সরাসরি জানায়, আবার প্রত্যাখ্যাত হলে সহজ বন্ধুত্ব সম্পর্কের দাবি করতেও কুণ্ঠিত হয় না। রজত অধরা মাধুরীর মতো তার মনোহারিকাকে ছন্দোবন্ধনে ধরতে চায়, সামান্য আঘাতেও অভিমানী হয়ে ওঠে। যতীন বস্তুবাদী, রজত ভাববাদী। তাই যতীন বলে "ছোটবেলা থেকেই আমি যে পাতায় অঙ্ক কষেছি, তার পাশেই

তুমি ছবি এঁকেছো।" রজতের সামনেও তাই জিজ্ঞাসা ছ্যাখা দেয়–"সত্যই কি চাই? অজন্তার চিত্রশালা, না কয়লার খনি? রবীন্দ্রনাথের গানগুলি, না লোহার কারখানা? এইসব সরল নগ্ন গ্রাম্যজীবন, না নগরের কৃত্রিম মুখোস পরা সভ্যতা? দুই-ই চাই? বাঁশীর সুরের সঙ্গে মোটরকারকে কে বাঁধিতে পারিবে?" তথাপি রজতের অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্য অনুসন্ধান: "কোন্ অনন্তযৌবনা উর্বশীর সন্ধানে তাহার শিল্পী-প্রাণ সাত রং-এর আলোছায়ায় রেখার পথ দিয়া তুলির টানে চলিয়াছে; বিশ্বকমলের সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কি মূর্তিমতী হইয়া তাহাকে একবার দেখা দিবে না? সেই মানসসুন্দরী যদি এখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—এই রং-এর ছায়া, এই আলোর মায়ায় নয়, রক্তমাংসে অনিন্দ্যসুন্দরী নারী হইয়া সে কি আসিবে না? জ্যোৎস্নাসমুদ্র মথিত করিয়া জলস্থলআকাশের সব সৌন্দর্য ছানিয়া পৃথিবীর সব মাধুরী চুরি করিয়া মধুর মূর্তি হইয়া দাঁড়াইবে না?"

রজত তার সেই স্বপ্নপ্রেয়সীকে খুঁজে পেয়েছে তার মানবীপ্রিয়া রমলায়— "রজত মুগ্ধনেত্রে একবার খোলা জানলা দিয়া বাহিরের আকাশের আলোছায়ার খেলা আর একবার ঐ প্রিয়ার অনুপম মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। ইহাকেই কি সে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পাইয়াছে আর হারাইয়াছে—এই প্রিয়াকেই কি সে কতরূপে কতবার যুগে যুগে অনিবার আনন্দলোকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছে?" তাই রজতের জগৎ পরিপার্শ্বছিন্ন, বাস্তব জীবন-জটিলতা ও দ্বন্দ্বহীন—"রজতের ছোট ঘরখানি যেন এই নগরের বাহিরে, এই ধন ও ভোগতৃষ্ণার চির-উদ্বেলিত সাগর-মধ্যে কোন্ প্রেমস্বপ্নের দ্বীপের মত।" বস্তুজিজ্ঞাসা যখনই জেগেছে, মামাবাবুর মৃত্যুর পর সংসারের দৈন্য ও বাস্তবতা রজত-রমলার দাম্পত্যজীবনকে গ্রাস করেছে ধীরে ধীরে, রজতের মনে হয়েছে তার সেই স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়েছে বুঝি, বুঝি শেষ হয়ে গ্যাছে তাদের যৌথজীবনের সমস্ত আনন্দের আয়োজন—"রজত ভাবিত, তাহার সেই স্বপ্নলোকের রমলা, তাহার প্রিয়া বুঝি মরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাসূর্যাস্তের শরৎ আকাশের মত তাহার স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সে খুঁজিত, কোথায় সেই মোহিনী রমলা, তাহার মনমাতানো রূপ, মদের মত ফেনিল, পুষ্প-সৌরভের মত আবেশময়? এ মুখ বড় করুণ মধুর।…কোন দিন বিকালে আসিয়া সে দেখিত রমলা হয়ত বাসন মাজিতেছে, ঝি আসে নাই। ঝি আসিলেও রমলা মাঝে মাঝে বাসন ধুইতে বসিত, ঝির ধোওয়া পছন্দ হইত না। বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরে রমলার বাসনমাজায় রজত যে সৌন্দর্য খুঁজিয়া

পাইত, আজ সে সৌন্দর্য কোথায়? রজত গভীর বেদনা বোধ করিত, নিজের উপর তাহার ঘৃণা হইত; এই দৃশ্যটা, ওই বাসনমাজার ঝক্‌ঝক্ শব্দটা সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। কোনদিন দেখিত কাজের তাড়াতাড়িতে একটু বিরক্ত হইয়া রমলা অতি ধীরেই খোকার গায়ে চাপড় মারিল বা হাতা দিয়া মাথায় একটা ঘা দিল। এখন খোকা আস্তে মারাতে কাঁদে না, কিন্তু ওই মৃদু আঘাত রজতের গায়ে ছিপটির ঘায়ের মত বাজে।"

তাহলে কি আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবো যে মণীন্দ্রলাল বসু বাস্তব পলায়নবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী? তা যদি হ'তো তাহলে সম্ভবত 'রমলা'র শেষে তিনি রজতেরই এই উপলব্ধিতে পৌঁছতেন না—"…রজত বিমুগ্ধ নেত্রে পিয়ানো-বাদিনীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই প্রিয়াকে সে এক অপরূপ সন্ধ্যায় প্রথম পিয়ানো বাজাইতে দেখিয়াছিল। সেই মদের মত তীব্র আবেগময় রূপ নাই বটে কিন্তু এ শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি তাহার চেয়েও মধুর সুন্দর পবিত্র।" স্বপ্ন এবং জীবনকে মিশিয়ে নিয়ে দ্যাখেন মণীন্দ্রলাল। তাই তাঁর দ্যাখা জীবনশিল্পীর ছ্যাখা, সৌন্দর্যমুগ্ধ স্রষ্টার ছ্যাখা।

মণীন্দ্রলালের সৌন্দর্য-নিরীক্ষার সার বলা যেতে পারে রমলা। হেলিয়োট্রোপ রঙের শাড়িপরা এই মেয়েটি বছরের পর বছর বাঙালি পাঠকের রোম্যান্টিক বাসনাকে পূর্ণ করে এসেছে। সৌন্দর্য আর প্রাণচাঞ্চল্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গ্যাছে রমলায় এসে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'যৌবনে দাও রাজটীকা' বলে যে যৌবনবন্দনাকে জয়যুক্ত করেছিলেন, 'সবুজপাত্রে'র পাতায় পাতায় যে যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ—সেই যৌবনেরই যেন প্রাণদূত রমলা।—"নির্নিমেষ নয়নে রজত এই পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, এ যেন একটা সুরের ছবি—চোখ দুইটির আনত কম্পিত রেখায় রাঙা ঠোঁট দুইটির আনন্দে তরঙ্গিত টানে, পদ্মরাগের মত আঙুলগুলির লীলায়িত ছন্দে, হেলিয়োট্রোপ রং-এর শাড়ির দুলিয়া-ওঠার ভঙ্গীতে, দেহের প্রতি রেখা সুরকে মূর্ত, গানকে গতিশীল সাকার করিয়াছে, পায়ের তলে লুটানো লাল পাড় হইতে উদ্ধত বেণীর কেশগুলি পর্যন্ত ছবির রেখাগুলি প্রাণের ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই রমলা ছবিখানিতে বিশ্বশিল্পী রেখাকে বক্ষে একটু উঠাইয়া কটিতে একটু গড়াইয়া কণ্ঠে একটু টানিয়া কেশে বাড়াইয়া শাড়ির পাড়ে দোলাইয়া কি বিচিত্ররূপ আঁকিয়াছে। এই দেহভঙ্গীর সুষমার দিকে চাহিতে চাহিতে রজতের চিত্ত কোন্ সঙ্গীতলোকে হারাইয়া গেল।" যৌবনের আনন্দে, যৌবনের প্রেরণায় রমলা যেন এক উদ্ভাসিত

সত্তা। যে জীবনকে তারুণ্যের আবেগ দিয়ে, তার পরিপূর্ণ আনন্দ দিয়ে শিরায়-শিরায়, অস্তিত্বের সমগ্র উদ্ভাসনে উপভোগ করতে চায়। তাই জীবনের কোনো মধ্যপন্থার সঙ্গে সে আপোষ করবে না, জীবনকে সে আতল স্পর্শ করবে। হাজারীবাগের বাড়িতে যে রাত্রে প্রত্যেকে কোন না কোন বেদনায় মথিত একমাত্র রমলাই সে রাত্রে—" · বাহিরের জ্যোৎস্নায় বসন্ত বাতাসের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছল যৌবনের অকারণ সুখে তাহার দেহ মন কানায় কানায় ভরা। যে-সব খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনায় অন্য মেয়েদের মনে মেঘ জমিয়া বজ্রগর্জন এমন কি বারিবর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া যায়, সে-সব ঘটনা সে হাসির হাওয়ায় নিমেষে উড়াইয়া দিত। বোর্ডিং-এর বন্দীশালায় থাকিয়াও তাহার মনের সজীবতা, আনন্দ উপভোগের শক্তি পঙ্গু হইয়া যায় নাই। চানাচুর কি জ্যোৎস্না রাত, গোলাপফুল কি ভালো ফিলম, ভালো গান কি কাপড়ের রং দেখিলেই সে নাচিয়া বলিয়া উঠিত, how lovely! তাহার দর্শনশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দুই ভাগ করা যায়—এক, I adore it, আর এক, I hate it; মধ্যপথ, কিছু নাই। সুখ জিনিসটা কি, কি করিয়া পাওয়া যায়, এসব ভাবিবার শক্তি বা সময় তাহার ছিল না। রমলার দর্শন অনুসারে অতীতের জন্য দুঃখ করিয়াই বা কি হইবে, ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন গড়িয়াই বা কি হইবে, যাহা পাও, উপভোগ করো, আনন্দ নিংড়াইয়া লও।"

এই রমলার ঠিক বিপরীত চরিত্র মাধবী। মাতৃহারা মাধবী পিতা যোগেশ-চন্দ্রের বিচিত্র খেয়ালের সঙ্গে মানিয়ে চলতে নিজস্ব জীবনস্ফূর্তিকে যেন একটা জায়গায় হারিয়ে ফেলেছে। শান্ত পাষাণ মূর্তি সুন্দরী মাধবী রজতকে সম্ভ্রমিত করে তুলেছে তার প্রতি, কিন্তু মাতিয়ে তুলতে পারেনি। মাধবীর নিঃসঙ্গ জীবন ও একাকিত্বময় কাঠিন্যের আবরণে প্রথম নিবিড় বেদনাময় অনুরাগের সঞ্চার করেছিলো রজত। রজতেরও এক প্রভাতের আলোতে মাধবীকে ভালোলেগে গেছিলো। কিন্তু সে ভালো-লাগা ভালোবাসায় পরিণত হ'তে পারেনি—মাধবী নিজেও পারেনি রজতের কাছে তার গাম্ভীর্যের বানিয়ে তোলা চেহারাটাকে ভেঙে অন্তরলোকের গূঢ়তম অভিব্যক্তিকে ইঙ্গিতবহ করে তুলতে বা প্রকাশ করতে। তাই আগত প্রভাতের আলো-ছায়ায় যে মাধবী মূর্তিমতী ঊষার মতো ছায়া দিয়েছিলো রজতের জীবনে, ঊষার মতোই স্বল্পায়ু এক রাঙিমা ছড়িয়ে সে মিলিয়ে গেলো। রমলা তার স্বাভাবিকতায় রজতের মনে যে সাড়া জাগিয়েছে, মাধবী তা পারেনি। লেখক পদ্মভরা দীঘি ও ফুলের প্রসঙ্গ এনে রজত-মাধবী ও রজত-

রমলা সম্পর্কের ক্রমশ গড়ে-ওঠা চেহারা দুটির ভিন্নতাকে তাৎপর্যময়, প্রায় যেন প্রতীকায়িত রূপ দিয়েছেন। মাধবী এবং রজত প্রসঙ্গে—"…কিছুদূরে এক রক্তপদ্মভরা দীঘি ঘুরিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিল। মাধবীর খুব ইচ্ছা হইয়াছিল কয়েকটি পদ্ম লইয়া আসে, কয়েকটি পদ্ম তটের অতি নিকটেই ফুটিয়াছিল; কিন্তু রজতকে তুলিয়া আনিতে বলা দূরে থাকুক, সে পদ্মগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে পারিল না, পাছে রজত তাহাকে তুলিয়া দেয়। দুইজনে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন ঘাসে ঘাসে শিশির শুকাইয়া গিয়াছে, পাথরগুলি তাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চোখে আকাশের আলো তখনও পদ্মরাগে রঙীন।" একই দিন রাত্রিতে রজত এবং রমলার কথা বলতে গিয়ে লেখক মিতকথনে জানিয়ে দিলেন, যে-সম্পর্ক রজত এবং মাধবীর মধ্যে সম্ভাব্য হয়েও অসম্ভব রয়ে গেলো তারই পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলতে গ্যালো রজত এবং রমলায় এসে—"…রমলা জলের নিকট গিয়া কয়েকটি পদ্ম ছিঁড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। রজতও ধীরে উঠিয়া জলের ধারে তাহার কাছে গিয়া বসিল। এ কয়দিন দুইজনের মনে যে কথাগুলি জমিতেছিল, সেগুলি মুক্তধারার মত অন্তর হইতে বাহির হইতে লাগিল।" "দুইজনে নীরবে পাশাপাশি চলিল। পথের দুই পাশের গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো রাঙা-পথে ছড়ানো অভ্রগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাস মাতিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, মাঝে মাঝে দু' চারটি ছোট ছোট কথা। সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতার সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত, এ স্তব্ধতার অনেক ভেদ। এ স্তব্ধতা যেন কি কল্লোলমুখর, অশ্রুসঙ্গীত-ভরা, অসহনীয় সুখময়—সকল কথাগানের অবসান হইয়া শব্দের নীরব অতল পারাবারে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই জ্যোৎস্নাধারাধৌত তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ মর্মরমুখর রক্তিম মায়াপথ দিয়া তাহারা দুইজনে যেন কত কাল চলিয়া আসিয়াছে, যেন কতযুগ চলিয়া যাইতে পারে। কেহ কাহারও মুখে চাহিতে সাহস করিল না, হাতে হাতে ধরিতেও ইচ্ছা হইল না, অন্তর অন্তরে স্পর্শ করিয়াছে।"

রমলার পরিণতি প্রেম-বিবাহ-সংসার-মাতৃত্ব—এইরকম স্বাভাবিকক্রমে। মাধবীর নিঃসঙ্গতা, পিতার অনুরোধ মাধবীকে রাজি করিয়াছে যতীনকে বিয়ে করতে। কিন্তু যতীনের বিত্তবাসনা আর দাম্পত্য দ্বিপথচারী হয়ে মাধবীর বিবাহিত জীবনের নিঃসঙ্গতাকে আরো করুণ ভয়াবহ করে তুলেছে। এই নিঃসঙ্গতার গ্লানিকে কাটিয়ে উঠতে মাধবী বেছে নিয়েছে পার্টি, হৈ-চৈ, তথাকথিত

ভ্রান্ত আধুনিকতা ও জীবনাবেগকে। রমলার পরিণতি পাশ্চাত্য গড়ন থেকে প্রাচ্যায়নে ডায়মেশনের বোর্ডিং থেকে সংসার ও মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে, আর মাধবীর পরিবর্তন নিজস্ব ছোট্ট গণ্ডী থেকে পাশ্চাত্যধর্মী আপাত জীবন উন্মাদনা ও উদ্দামতায়। মণীন্দ্রলাল বসু নাগরিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ, উচ্চ মধ্যবিত্ত, আধুনিক ও শিক্ষিত নরনারীর কথা মূলত বললেও তার গোপন পক্ষপাত শাশ্বত ভারতীয় জীবন—ভাবনায়। অর্থাৎ জীবনের শেকড় তিনি খুঁজতে চেয়েছেন দেশীয় ঐতিহ্যের গভীরে। তাই মাধবীকে একদিন তার বিভ্রান্ত ছুটে চলা থেকে ফিরে আসতে হয়, তার সব আশ্রয় ও সান্ত্বনা সে খুঁজে পায় মাধবী-দ্বীপের গরীব মানুষগুলোর জীবনযাত্রায়।

মণীন্দ্রলাল নারীর বিশ্বরূপ দেখতে চেয়েছেন তার কল্যাণময় মূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথ যেমন সেই সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন যা মাঙ্গল্যের সঙ্গে যুক্ত, মণীন্দ্রলালও ভারতীয় দর্শনভাবনায় ভাবিত—তিনিও সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে একীভূত করে দিতে চান। তাই তাঁর জীবনসত্য মঙ্গলাদর্শও বটে, সৌন্দর্যাদর্শও বটে। নারীকে তিনি প্রিয়া থেকে উত্তরিত করেন গৃহিণী এবং এবং মাতায়—আর তার সেই মাতৃত্বের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা। এই মাতৃত্বহীনতায় মাধবী অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্ত, বিপথচারিণী। আর এই মায়ের আবেগে ও স্নেহে রমলা আপাত দারিদ্র্যের মধ্যে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর। রমলার আসন্ন মাতৃত্বের যে ছবি মণীন্দ্রলাল এঁকেছেন—সে মেটারলিংকের 'ব্লুবার্ড' শুনতে শুনতে তার অস্তিত্বের প্রান্তদেশে পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে তার আগত সন্তানের—রবীন্দ্রনাথের মায়ের মতো তারও সেই সন্তান যেন ইচ্ছে হয়ে তার বুকের মাঝখানে ঘুমিয়ে ছিলো। ভাবী মাতা রমলার মন কেঁপে উঠেছে আশায় আর আশঙ্কায়, আনন্দে আর সম্ভাবনায়—"রমলা আর বুনিতে পারিল না, সে অতি আদরের সহিত একহাতে পশমগুলি ধরিয়া আর এক হাতে রজতের হাত ছুঁইয়া কোন মায়াস্বপ্নের ঘোরে শুনিতে লাগিল। মায়ের প্রাণের রং দিয়া মায়ের বুকের অগাধ স্নেহ দিয়া রচিত, আশা স্বপ্ন নিয়া গঠিত এই অজাত শিশুদের স্বর্গলোকের কথা শুনিতে শুনিতে মন শঙ্কায় আশায় দুলিয়া উদাস মধুর হইয়া উঠিতেছিল।"

মেয়েদের মাতৃত্ব কেবল তার সন্তানদের কেন্দ্র করেই জেগে ওঠে না—সেই আবেগের প্রকাশ যে-কোনো অবলম্বনকে ঘিরে ঝর্ণাধারায় বিচ্ছুরিত হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন'-এর শর্মিলাকে 'মায়ের জাতের নারী বলে চিহ্নিত করে-

ছিলেন। নারীর মধ্যে 'মায়ের জাত'—এরকম কোনো আলাদা শ্রেণীবিভাগ হ'তে পারে না। সব মেয়েই মূলত মা—তার স্বামীও তার কাছে এক জায়গায় স্নেহাস্পদ। রমলার মাতৃত্ব যেমন তার খোকাখুকীদের নিয়ে, তেমনি তার মামা-বাবুকে নিয়ে, আবার তেমনই তার মাতৃত্বের বিকাশ অসুস্থ রজতকেও কেন্দ্র করে; "রোগশয্যায় মানুষের মধ্যের চিরকালের শিশুটি জাগে, সে নারীর সেবা হস্তের শান্তিস্পর্শের জন্য তৃষিত হইয়া উঠে। তখন মানুষের অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম হয়। প্রতিদিন আপন স্বার্থের অন্ধবেগে কাজের ধূলা উড়াইয়া চলিতে চলিতে ঘরের কোণে কোণে আনন্দ চাপা পড়ে; যে-সব ছোটখাট কথা খুঁটিনাটি ঘটনা লইয়া জীবনের মালা গাঁথা সেই প্রাত্যহিক কথা ও কাজগুলির বুকে লুকান অমৃতের সঙ্গে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগশয্যায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত নূতন করিয়া আবিষ্কার করা যায়—একটু পাখার বাতাস, মাথায় হাতের স্পর্শ, এক গেলাস জল গড়াইয়া দেওয়া, একটু মুখের হাসি, শাড়ীর পাড়ের রং, একটু প্রভাতের আলো, একটি ফুলের গন্ধ, আস্তে আস্তে কয়েকটি মিষ্ট কথা—প্রত্যেক জিনিষ নূতন রসে অনুভব করা যায়।" স্বভাবতই, তুলনামূলকভাবে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের কথা—"এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে।"

যে রমলার পরিচয়পর্বের সূচনা উচ্ছল তরুণীরূপে, তারই পরিণতি—"এ কেবল মায়াবিনী প্রিয়া নয়, এ মঙ্গলময়ী মাতা, কল্যাণী নারী, শান্তির আনন্দ-রূপ।" রবীন্দ্রনাথের 'প্রিয়ার জাত' আর 'মায়ের জাত' মূলত আলাদা দুটি স্তর নয় নারীচরিত্রে—তারা একই নারীর ক্রমিক উত্তরণ বা বিবর্তন।—মণীন্দ্রলালের রমলা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

৪

মণীন্দ্রলাল বসু তাঁর 'রমলা'র প্রধান চরিত্রগুলিকে যেমন পরিপূর্ণায়ত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন তেমনি গৌণ চরিত্রনির্মাণেও তাঁর শিল্পীর ঘনিষ্ঠ ভালোবাসা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজী সাহেবের চরিত্রটি। কাজী চরিত্রটির সঙ্গে উপন্যাসের মূল ঘটনার যোগ সামান্যই,

অথচ এই চরিত্রটি গোটা উপন্যাসের আবহনির্মিতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বারো পরিচ্ছেদের শেষে মাধবীর বেদনার অনুষঙ্গে কাজী সাহেবের মুখের জেবুন্নিসার কবিতাটি অসাধারণ পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। এ যেন মাধবীর সমস্ত হতাশা আর বেদনাকে আরো প্রত্যক্ষ, আরো তীব্র করে তুলেছে। কবিতাটির বাংলা তর্জমাটি এরকম "প্রিয়া প্রেমকে জিজ্ঞাসা করলুম, প্রেম তুই কি লাভ করলি? প্রেম উত্তর দিল, অশ্রু ও রোদন ভিন্ন কিছুই না।" মাধবীও প্রেমের কাছ থেকে অশ্রু ও রোদন ছাড়া আর কিছুই পায়নি।

উপন্যাসের শেষে এই কাজী সাহেবের সূত্রেই রজত রমলা ফিরে এসেছে হাজারীবাগের বাড়িতে। কাজী সাহেবের উপস্থিতি রজত-রমলার দাম্পত্যজীবনের পরিণত দিনগুলিকে একটি শান্তশ্রী দান করেছে। সমাসন্ন শেষের প্রহরের দিকে তাকিয়ে-থাকা এই মানুষটির স্নিগ্ধ প্রশান্তি রমলার পারিবারিক জীবনের আনন্দে এক অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজিত করেছে—"... বিকেলবেলায় একটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে লুকোচুরি খেলিতেছে, ঝাড়ের ধারে বারান্দায় এক চেয়ারে কাজী সাহেব খেলার বুড়ী হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এখন অতিবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এখন আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ছুটিয়া খেলিতে পারেন না, বুড়ী হইয়াই থাকিতে হয়। তাঁহার কোলে কতকগুলি ছবি, খেলনা, পুতুল; সেগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া ছেলেরা খেলিতেছে। দীর্ঘ পক্ষ দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি উদাস দৃষ্টিতে পশ্চিমের ধূসর গিরিমালার উপর পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপে অস্তমিত সূর্যের বর্ণমাধুরীলীলা দেখিতেছিলেন। তাঁহার জীবনসূর্যও শীঘ্রই অস্তমিত হইবে। সূর্যের আলো যেমন সম্মুখের ফুলগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছিল, তেমনি দীপ্তনেত্রে তিনি রহস্যময় শিশুগুলির খেলা দেখিতেছিলেন।" আমাদের মনে পড়ে যায়, কোন কোন বিদেশী সাহিত্যের কথা।[৪] অথচ এই কাজী সাহেব—"... পথের ধূলায় জন্মেছিলুম, কোন্ ঘরহারা মা যে আমায় পথে জন্ম দিয়ে গেছলো তাঁকে তো আমি জীবনে দেখিনি।" দিল্লীর এক প্রসিদ্ধা বাইজী এই শিশুকে পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেন। তাঁর সেই পালিতা মা-র মধ্যে কাজী দেখেছিলেন বিশ্বের মোড়কের তলায় এক অমৃতময়ী মাতৃত্বকে। ১৩৩৩-এর আষাঢ় সংখ্যা 'কালি কলম'-এ 'যদি ফিরে আসি' কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন "জন্ম লব হয় তো সে / ...কোন জীর্ণ ঘরে কোন বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে দীনা কোন পথের নটীর কোলে।" হয়তো 'রমলা'র কাজী সাহেবই এইরকম ভাবনায় প্রাণিত করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্র

বলেছেন, তাঁর লেখায় প্রভাব আছে মণীন্দ্রলাল বসুর।

যোগেশচন্দ্র এক অদ্ভুত চরিত্র। তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনোন্মাদনা, অতৃপ্ত প্রেমবাসনা আর নিভৃত প্রবাসের একাকীত্ব নিয়ে এক অদ্ভুত প্রতিবেশ তৈরি করেছেন 'রমলা' উপন্যাসে। মাধবীর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য অনেকটাই দায়ী যোগেশচন্দ্র। যোগেশচন্দ্রের উন্মাদনার অস্বাভাবিকতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এবং পিতারই অনুরোধে মাধবী বিয়ে করেছিলো যতীনকে। যোগেশচন্দ্রের জীবনের ট্র্যাজেডিও অদ্ভুত। তিনি ভালোবেসেছিলেন রমলার মা বিভাকে। কিন্তু যেদিন বিবাহপ্রস্তাব দেবেন সেদিনই সকালে তিনি পেলেন বিভার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। পরে তিনি মাধবীর মাকে বিয়ে করেন, কিন্তু সে বিয়ে তাঁর দাম্পত্যজীবনকে সুখময় করতে পারেনি। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর প্রিয়তমার রূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন: "তিনি অতি করুণ হাসিয়া উঠিলেন, বা, বা, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে, বিভা! এসেছ, ও, dear dear—তিনি একটু উঠিতে চেষ্টা করিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িলেন।" মনে পড়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাসের সর্বজয়ার মৃত্যুর কথা—যেখানে মৃত্যু এসেছিলো তার ছেলের রূপ ধরে।

উপন্যাসে ললিত এবং শচী পরস্পর বিপরীত দুটি চরিত্র। ললিত বন্ধুর ভূমিকায় রজত-রমলার দাম্পত্যকে মধুরতর করে তুলেছে, শচী মাধবীর স্তাবকের ভূমিকায় নিজেকে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দিয়ে ভ্রান্তির পথকে প্রশস্ততর করেছে। উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগহীন উমার কাহিনীঅংশটি বাস্তবের তীব্র মূর্তিতে উপস্থাপিত। মণীন্দ্রলাল যে আদ্যন্ত রোমান্টিক হলেও বাস্তববিমুখ নন, তার প্রমাণ এই উপকাহিনীটির উপস্থাপনায়। উমার মধ্যে রমলা একসময়ে নিজের ভবিষ্যৎ-কে দেখছে—এই ভয়ে কেঁপে উঠেছে। উমা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারের সহিষ্ণুতার প্রতিমা।

৫

মণীন্দ্রলাল বসুর দ্বিতীয় উপন্যাস 'স্বপ্ন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' থেকে এটি প্রকাশিত হতে থাকে, শেষ হয় ১৩৩১-এর শ্রাবণে। উনিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত উপন্যাসটি ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয়, বিদ্বেষ-জর্জরিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ক'রে দেবার স্বপ্ন উপন্যাসটির বিষয়বস্তু।

মণীন্দ্রলাল বসুর তৃতীয় উপন্যাস 'জীবনায়ন'। উপন্যাসটি ১৩৪১-৪৩ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত। অনুরোধের দাবি মেটাতে মণীন্দ্রলাল উপন্যাসটি লিখেছিলেন।[৫] ১৩৪৩ সালের আশ্বিনে এটির গ্রন্থরূপে প্রকাশ। 'রমলা'র অল্পবয়সের রোম্যান্টিসিজম জীবনায়নে অনেক বেশি পরিণত ও সংহত। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য বলেছেন : "বাস্তব সমাজ বর্জিত রোম্যান্টিক কল্পনার মায়াময় প্রকাশ দেখা গেল 'রমলা'য়। তবে মনে হয় এ যেন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরের মায়াময় জগৎ। তার তুলনায় বরং মণীন্দ্রলালের পরবর্তী উপন্যাস 'জীবনায়ন' জীবনধর্মী। অরুণ ও উমা চরিত্র দুটি পাকা হাতে আঁকা।"

জীবনায়ন অনেকটা আত্মজৈবনিক উপন্যাস। মণীন্দ্রলাল আত্মবীক্ষাকে এখানে অরুণের জীবনবীক্ষায় পরিণত করেছেন। তাই অরুণের অনুভূতি আর লেখকের অনুভূতি অনেক জায়গায় সমীকৃত হয়ে গ্যাছে। কলেজ জীবনের প্রথম দিনে চট্টগ্রামের ছেলে শিশিরকুমার সেনকে সহপাঠীবন্ধু হিসেবে পেয়ে অরুণের স্মৃতিতে জেগে উঠেছে তার শৈশবের ফেলে আসা চট্টগ্রাম আর কর্ণফুলী নদীর কথা : "চট্টগ্রাম! কর্ণফুলী নদী! অরুণের শৈশব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।... কর্ণফুলী নদী কি সুন্দর! দুই তীরে ছোট ছোট পাহাড়, ঝাউবন। মধ্যে কর্ণফুলী নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। অরুণের মাতা বলিয়াছিলেন, দেখ্ খোকা, কি সুন্দর দেশ! অরুণ বলিয়াছিল, ঠিক রূপকথার কেশবতী রাজকন্যার দেশের মত, নয় মা?" কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মণীন্দ্রলাল বসুকে যে সম্বর্ধনা দেন, সেখানে অভিভাষণ দিতে গিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন : "কর্ণফুলি! কলিকাতার জনকল্লোলে অশান্ত পরিবেশে মনে মনে ভাবি তারে, শৈশবের স্বপ্নলোকে যাইবার প্রয়াস—স্মৃতির পটে ছবি ভাসিয়া ওঠে, টি-ভি-র চঞ্চল ছায়াচিত্রে প্রবাহের মত জলজলে নয়, কাল প্রবাহে মলিন হইলেও শান্ত সুন্দর।"

জীবনায়ন বয়ঃসন্ধি থেকে যৌবনপ্রবেশের কাহিনী। এই জীবনপর্বের যে অশান্ত বেদনা, যে উদ্দাম প্রেরণা, যে নব পরিচয়ের মাধুর্য—তার সামগ্রিক উন্মাদনাকে মণীন্দ্রলাল প্রকাশরূপ দিয়েছেন জীবনায়নের অরুণে। কৈশোরের প্রান্তে পৌঁছে অরুণ কোন নিগূঢ় অনুভবে "দিশেহারা উদাস হইয়া যায়।" লেখক বলেন : "জীবনের এই কাল অনেকের পক্ষে সুমধুর নয়। যৌবন সিংহদ্বারের প্রবেশপথ বেদনাময়। বাল্যের সরলতা সহজ চপলতা হারাইয়া কিশোর গম্ভীর হইয়া যায়। বালকদের দলে তাহার স্থান নাই, বয়স্করাও তাহাকে বয়সে বড়

হইয়াছে বলিয়া মানে না। তাহার ইচ্ছা করে, সে খুব শীঘ্র বয়স্কদের সমান হইয়া ওঠে।" অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের কথা, যেখানে তিনিও এই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিতে দাঁড়ানো বয়সকালের অসহায়ত্বের কথা বলেছেন : "...তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়-চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধা স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্যে তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।"

মণীন্দ্রলালের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতো গভীর তা টুকরো টুকরোভাবে শব্দপ্রয়োগে, বাক্‌প্রতিমানির্মাণে বা প্রাসঙ্গিক কোন কোন সূত্রে 'রমলা'-য় বোঝা গেলেও তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির গড়ে ওঠার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই যে ছিলেন উৎস এ-কথা আরো পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে, জীবনায়নে। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে এ উপন্যাসে। সমকালীন বাস্তবতার তথাকথিত ধারণা নয়, রাবীন্দ্রিক ভাবনাদর্শই যে অরুণের জীবনপথের সবচেয়ে বড়ো মূলধন—একথাও বোঝা যায় জীবনায়ন পড়লে। জয়ন্তের ধারণা "এটা বস্তুতন্ত্রের যুগ, সন্দীপ হচ্ছে এ যুগের হোতা"—একে অরুণ মানতে পারে না। শিশিরের নারীর দেহাশ্রয়ী জয়ন্তর লেখা কবিতাগুলি পড়ে তাকে মনে হয় 'রোমান্টিক ডেকাডেন্ট'। বাস্তব সম্পর্কে তাদের ধারণা ভিন্ন—"হৃদয়ের তাপ ও আক্ষেপের সঙ্গে নারীর দেহ রূপ বর্ণনা করলেই বাস্তব হয় না।"

'সবুজপত্র' বাংলাসাহিত্যের এমন একটি কাগজ যা যৌবন শব্দটির সঙ্গেই যেন প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো বাংলা সাহিত্যের। এই সবুজপত্রের মণীন্দ্রলাল ছিলেন পাঠক : "বন্ধু ফণিভূষণ চক্রবর্তির হিন্দু হোষ্টেলের তেতলার কিউবিকুলে "সবুজপত্র", অরবিন্দের "আর্য্য পত্রিকা" পাঠ, আলোচনা তর্ক;"। অরুণেরও কলেজ জীবনের সাহিত্যচর্চায় ও আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো সবুজপত্রের—"হিন্দু হোষ্টেলে শিশির সেনের অন্ধকার ছোট ঘরে প্রায়ই আড্ডা বসিত। চা-পান ও সিগারেটের ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি,

জীবনের উদ্দেশ্য, সভ্যতার ভবিষ্যৎ, প্রফেসারগণের পড়ান, 'সবুজপত্রে' 'ঘরে বাহিরে' নানা বিষয়ে তর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা হইত।" আসলে, জীবনায়ন পড়লেই বোঝা যায় মণীন্দ্রলালের সাহিত্যবাক্তিত্ব তৈরিতে কোন কোন পরিমণ্ডল প্রভাব ফেলেছিলো। সবুজপত্রের প্রসঙ্গ এই কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মণীন্দ্রলালের রচনায় যে যৌবনরাগের পরিচয় পাওয়া গ্যাছে সবুজপত্র অনেক ক্ষেত্রেই ছিলো অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণাগুলির অন্যতম।[৬]

এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। নিজের জীবনে মণীন্দ্রলালের বিশ্বসাহিত্যের জানলাটা অনেকটাই খুলে গিয়েছিলো প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং তার শিক্ষকমণ্ডলীর সান্নিধ্যে।—"কলেজে প্রবেশ করিয়ে যে স্বাধীনতা পাইলাম, সে মুক্তির পরিবেশে তরুণ অন্তরে জ্ঞান পিপাসা, নব নব আইডিয়ার সহিত পরিচয়ের আনন্দ জাগিয়া উঠিল। প্রতিদিন লাইব্রেরীতে বসিয়া নূতন বই পড়া, নূতন সতীর্থের সহিত পরিচয় আলাপ বন্ধুত্ব, ক্লাসে বিদগ্ধ প্রফেসারের ইংরাজীতে বক্তৃতা শোনা (১৯১৪-১৯২০)। ভাবি, আমি যদি প্রেসিডেন্সী কলেজে না পড়িতে পাইতাম, এরূপ গল্প লেখক হইতে পারিতাম না,…শনিবার বিনা পারমেণ্টেজের ক্লাসে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'ম্যাকবেথে'র অভিনয়পূর্ণ ব্যাখ্যান শোনা; অধ্যাপক কবি মনমোহন ঘোষের কীটসের 'ওড' গুলি আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে সুদূরপিয়াসী তরুণ অন্তর উদাসী হইয়া যায়—অজানা সিন্ধুতীরে ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পাষাণ দুর্গের মায়াময় গবাক্ষ খুলিয়া কোন্ বরবর্ণিনী সঙ্গীতচঞ্চলিতা, দেখা যায় না।" অরুণের জীবনেও প্রেসিডেন্সী কলেজের বিরাট ভূমিকা: "কলেজ ষ্ট্রীটের উপর পুরাতন কলেজের বৃহৎ বাড়িটি অরুণের নিকট রহস্য-পুরী ছিল। শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়, ওখানে মুক্তির আনন্দ আছে।" কবি মনোমোহন ঘোষ মণীন্দ্রলালের ছাত্রজীবনকে শিক্ষকতার মায়ায় আবিষ্ট করেছিলেন। জীবনায়নে মনোমোহন ঘোষের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে গ্যাছে: 'অরুণ কাহারও নাম জানে না। কেবল, কবি মনোমোহন ঘোষের নাম শুনিয়াছিল।" জীবনের প্রান্তে পৌঁছে আজও মণীন্দ্রলাল প্রথমেই স্বীকার করেন তাঁর সাহিত্যমানস গড়তে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলো তাঁর বিদ্যায়তন এবং তাঁর শিক্ষকেরা।[৭] অরুণের জীবনের মতোই একদিন মণীন্দ্রলালের জীবনেও হয়তো এমনি করেই শুরু হয়েছিল বিশ্বমন্ত্রে দীক্ষা: "সে হইয়া উঠিল কল্পলোকের অধিবাসী, নানা যুগের নানা দেশের কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন রসসমুদ্রে সুধাপান করিয়া কল্পনার পাল উড়াইয়া তরী ভাসাইয়া দিল, সাহিত্যলোকের সহিত বাস্তব পৃথিবী মিশিয়া একাকার

হইয়া সূক্ষ্ম রঙীন হইয়া উঠিল।"

"মহাকাব্য, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, পৃথিবীর নানা কালের নানা জাতির সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণের সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন সমবেদনায় জড়িত হইয়া যায়।

বাল্মীকি, বেদব্যাস, মম্‌সেন, টুর্গনিভ, টলষ্টয়, হাডি, হোমার, বিদ্যাপতি, গেলী, সকলে তাহার ঘরে ভিড় করিয়া আসে।"

কেবল অরুণের জীবনের সারস্বত-ইতিহাস নয়, তার বাক্তিক ইতিহাসকেও বড়ো চমৎকার রঙে এঁকেছেন মণীন্দ্রলাল। কৈশোরের অবুঝ ভালো-লাগা, যৌবনের প্রথম অনুরাগ কীভাবে ভেতরে ভেতরে দুটি ছেলেমেয়েকে ভাঙে গড়ে, কাছাকাছি নিয়ে আসে অরুণ-উমায় তারই কথা। এরই মাঝে এসেছে মল্লিকা মল্লিক। উমার মধ্যে অরুণ যদি শান্ত নদীর সংযম আর গভীরতাকে দেখে থাকে মল্লিকায় সে দেখেছে সাগরের ঊর্মিমুখর প্রাণচাঞ্চল্য। মল্লিকা অরুণকে টালমাটাল ক'রে দিয়েছিলো, যে অনুভবের কথা উমাকে কেন্দ্র করে ধরা দিয়েও ধরা ছায়নি, মল্লিকার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস তার সঙ্গে অরুণের কেবল পরিচিতি ঘটালো তা-ই নয়, মুহূর্তে যেন সব রহস্যের কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গ্যালো নিজের দীপ্তিতে। মল্লিকার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক তার সৌন্দর্যের সঙ্গে সামুদ্রিক অনুষঙ্গকে যেন একাকার করে দিয়েছেন: "মল্লিকা অরুণের পার্শ্বে সোফায় আসিয়া বসিল। লেস-বসান নীচু গলা জ্যাকেট, গলায় রঙীন কৃত্রিম পাথরের লম্বা মালা, কানে মুক্তার দুল, হাতে সোনার চুড়িগুলির সহিত বেলোয়ারী চুড়ি, হালকা নীলরঙের শাড়ীতে সোনার আঁচলা; পিঠে ঈষদার্দ্র কালো চুলের বন্যা।" মল্লিকা অরুণের জীবনে মুক্তবাতাসের মত নতুন জীবনচঞ্চলতা নিয়ে এসেছিলো, নবীন মেঘের মতো অরুণকে সঞ্জীবিত করেছিলো নতুনতর জীবনবোধে—

"I bring fresh showers for the thirsting flowers
From the seas and the streams"—

একেবল মল্লিকার আবৃত্তি নয়, এই তার অস্তিত্বের মৌল জায়গাটি। সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসের মতো আনন্দ জাগানোই তার পরিচয়, তার স্বভাব—"অন্ধকার অনন্ত সমুদ্রে দুইটি জাহাজ ক্ষণিকের জন্য পাশাপাশি এসে চলে গেল, আবার তাদের দেখা হবে কিনা কে জানে!…পৃথিবীতে আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী…।" মল্লিকা অরুণকে রক্তমাংসের অস্তিত্ব দিয়ে নারীবিশ্বের সঙ্গে প্রথম পরিচিত করিয়েছে—"অরুণের বাড়ির নিকট আসিতে, মল্লিকা তাহার অতি নিকটে আসিয়া তাহার

অধরে চুম্বন করিল।" মল্লিকা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ায় রমলাকে, তার জীবন-উচ্ছলতাকে। তবে জীবনায়নের শিল্পী পরিণততর সংযমী।

উমা চরিত্রটির মধ্যে অসাধারণ সংযম প্রায় যেন কাঠিন্যে পৌঁছেছে। উমা অরুণের কৈশোর থেকে যৌবনের মাধ্যন্দিন প্রহর পর্যন্ত সবচেয়ে দীপ্ত, সবচেয়ে স্থায়ী। অথবা উমা যেন কোথাও ধরা দিয়েও অধরা। বস্তুত, এমন ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র মণীন্দ্রলালের লেখায় আর একটিও সম্ভবত নেই। অরুণের ভেতরের পুরুষকে জাগিয়েছিলো মল্লিকা, আর তার মধ্যেকার প্রেমিককে জাগিয়েছে উমা—"উমার একটু হাসিভরা চাউনিতে সমস্ত দিনটি প্রসন্নতাভরা হয়, উমার মুখের একটু বিষণ্ণতায় সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসে। উমা যেদিন ভাল করিয়া কথা কয় না, অরুণের দিনরাত্রি নিরানন্দময়, উমা যেদিন ডাকিয়া গান শোনায়, অরুণের ইচ্ছা করে কোন মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়।

সে চণ্ডীদাস খুলিয়া বসে—

'পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন সার।"

কিন্তু তবুও "অরুণ বুঝিতে পারে, উমা অরুণকে সুহৃৎ রূপে চায়, প্রেমিকা রূপে নয়।"

অরুণের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে অরুণ যেন এক মানব দীক্ষা আত্মপ্রস্তুত করে। 'ধর্মের জন্য পুণ্যের জন্য' নয়, "গ্রামবাসীদের অসহায়তা, নিদারুণ দারিদ্র্য, নিজ স্বার্থরক্ষা ও কর্মশক্তির অভাব দেখিয়া উত্তেজিত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।" অরুণের প্রেমিকসত্তা উত্তরিত হয় মানব-হিতৈষণায়—"পূর্বে সে ছিল প্রেমিক, কবি, উদাসী, ভাববিলাসী। এখন সে ভাবে, আমি দুঃখের সাধক। জীবনে দুঃখের অর্থ, সার্থকতা কে বলিতে পারে?"

অরুণের এই পরিবর্তনের কোনো সুস্পষ্ট বাঁকের কথা পুস্তকাবদ্ধ জীবনায়নে নেই, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশের সময় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) উপন্যাসের একটি অংশ ছিলো, যা অরুণকে বুঝতে আরো প্রয়োজনীয়—"উমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, আমি জানি, তুমি কি বলতে চাও, কিন্তু সে কথা বলে কোন লাভ আছে কি? কেন তুমি নিজেকে এমন 'চীপ' করো?

"অরুণ আপনাকে দমন করিতে পারিল না। সারাদিন খাটিয়া তাহার দেহ যেমন শ্রান্ত তাহার মন তেমনি উত্তেজিত। সে একটু রুক্ষ স্বরে বলিল, ভালবাসা সে কি সস্তার, সেটা চীপ জিনিষ?"

লেখক কেন এ অংশটুকু পরে বাদ দিয়েছিলেন জানি না, তবে এটুকু থাকলে বোধহয় অরুণের পরিবর্তনগত স্তরগুলি বোঝা অনেক সহজ হ'তো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত'-র (১৯৩২) অপুর সঙ্গে জীবনায়ণের (১৯৩৬) অরুণের অনেক জায়গায় চারিত্রিক মিল আছে। দুজনেই মূলত একটা জায়গায় 'উদাসী, সুদূরের পিয়াসী'; দুজনেরই জীবনবোধ রোম্যান্টিক, ভালোবাসাধর্মী। অপরাজিত যেমন অপু-র অন্তরজীবনের ইতিহাস, জীবনায়নও অরুণের এইরকম বিবর্তনের ধারক। তবে অপু আরো বিস্তৃত, আরো ব্যাপ্ত – তার জীবন এবং অভিজ্ঞতা ব্যাপক। তুলনায় অরুণের জীবনধারা অনেকটাই একমুখী। অপু-র কৃচ্ছতা অরুণের স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে জীবনসংগ্রামের সীমানাকে গণ্ডী-আবদ্ধ করে দিয়েছে। সর্বোপরি, বিভূতিভূষণের রাখালিয়া-জগৎ মণীন্দ্রলালের আদৌ নেই।

৬

মণীন্দ্রলাল বসুর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত তৃতীয় উপন্যাস 'সহযাত্রিণী'। উপন্যাসটি ১৩৪৭ সালের 'অলকা' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৪৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। সহযাত্রিণী উপন্যাসটি 'শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় প্রীতিভাজনেষু' উৎসর্গীকৃত।

সহযাত্রিণী একটি ট্রেনের কয়েকটি কামরার চলমান ছবি। দুটি রাত এবং একটি প্রভাতের কথা বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। অনেকটা ফিল্মের চিত্রনাট্যের মতো টুকরো টুকরো কিছু দৃশ্যে উপন্যাসটি সাজানো। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সময়ে মনে হয় ফিল্মনির্মাতা-র ক্যামেরা যেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে গেল। উপন্যাসটির আরেকটি সার্থকতা চলমান ট্রেনের গতির ছন্দকে যেন ঘটনার ক্রমদ্রুততায় ধরা আছে। প্লটের বিচারে উপন্যাসটি অবশ্য বৃত্তায়ত। 'রমলা'র মতোই সূচনা আর সমাপনকে লেখক অদ্ভুত কৃতিত্বে মিশিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম পাতাতেই এরকম দুটি অনুচ্ছেদ আছে—

"পকেট থেকে ছোট্ট ঝক্‌ঝকে লাইটার বাহির করে কল্যাণ পাইপে অগ্নি-সংযোগ করলে। ছোট ভাগ্নী দীপিকা পাশে দাঁড়িয়েছিল, আইসক্রীম বিক্রেতার গাড়ী কাছে এলেই ডাকবে। ঝক্‌ঝকে ছোট দেশলাই দেখে সে লাফিয়ে উঠল। এমন আশ্চর্য্যকর দেশলাই সে আগে কখনও দেখেনি। একটা কল টিপলে আগুন জ্বলে ওঠে। সে ব্যগ্র হয়ে বললে, রাঙামামা, আমাকে দাও একবার, আমি জ্বালব না, শুধু হাতে ধরে থাকব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-গাড়ী হতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শিবাজী চেঁচিয়ে উঠল, আমি একবার জ্বালাব দিদি!"

উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের প্রায় উপসংহারে উপনীত হওয়ার পর এরকম দুটি অনুচ্ছেদ আছে—

"ছোট্ট ঝক্‌ঝকে লাইটারের সাহায্যে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে কল্যাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-গাড়ীর সামনে এল দাঁড়াল। দীপিকা সাজ করে গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়েছিল, কল্যাণকে দেখে গাড়ী হতে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলে; ওই আশ্চর্যকর ঝকঝকে দেশলাইয়ের ওপর তার লোভ। কল্যাণের হাত ধরে ব্যগ্র হয়ে সে বললে, রাঙামামা, আমাকে দাও একবার, আমি জ্বালাব না, শুধু হাতে ধরে থাকব।

গাড়ীর জানালা হতে মুখ বাড়িয়ে শিবাজী চেঁচিয়ে উঠল, আমি একবার জ্বালাব দিদি।"

এই বৃত্তায়িত ভঙ্গিমাটির মধ্যেও যেন একটি ফিল্মীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে।

সহযাত্রিণী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ অনুপমা। অনুপমা-ই সহযাত্রিণী। অনুপমা মণীন্দ্রলালের অন্যান্য নায়িকাদের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর, তবে তার সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিত্বের মিলনে সে উপমাহীন। দক্ষ শিল্পীর নৈপুণ্যে মণীন্দ্রলাল কল্যাণকুমারের চোখে অনুপমাকে প্রথম উপস্থিত করেছেন—"গজদন্তশুভ্র কপোলের এক অংশ দেখা যাচ্ছে, চিবুকের চারু-রেখা যেন সুদূরে বিলীন, ঘননীল বর্ণের ব্লাউজের ফোলা হাত রক্তবর্ণ স্থলপদ্মের মত। নয়নানন্দকর এ রূপলাবণ্য।"

মণীন্দ্রলালের সৌন্দর্যবর্ণনা পড়লে তাঁকে সৌন্দর্য সাধক মনে হয়—অতন্দ্র দ্রষ্টার মতো তিনি যেন রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়ে দ্যান, আর সেই রূপ-বিহ্বলতায় যৌবনের বনে তাঁর মন হারিয়ে যায়।

অনুপমাকে আমরা এক অর্থে মাধবীর ('রমলা') পরিণত ভাবতে পারি। মাধবীতে নারীর বিশ শতকীয় জীবনজিজ্ঞাসা এসে যুক্ত হয়েছিলো। যতীনের সঙ্গে বিয়ের পর ক্ষণিক মোহস্বপ্ন ভেঙে যাবার পর মাধবীর মনে হয়েছিলো—"এ ভুল সংশোধন করিবার কি কোন উপায় নাই? তাহা হইলে কি সমস্ত জীবন দুইজন দুইজনকে ফাঁকি দিবে, প্রেমের ভণ্ড অভিনয় চলিবে···। কি একখানি ইংরেজী নভেলে মাধবী পড়িয়াছিল, we marry only to develop ourselves. Why should we otherwise marry at all? আত্মার বিকাশের

জন্যই বিবাহ, তাহা ছাড়া বিবাহের অন্য সার্থকতা কোথায়?' মাধবীর অতৃপ্ত প্রেমবাসনা ভুলের পথে এগিয়েছিলো, আর অনুপমার 'হাঙ্গেরীয় ব্লাউজের নীচে স্পন্দিত বক্ষপঞ্জর'-এ সে শুনেছে মৃত্যুর বার্তা, তবুও অদ্ভুতভাবে সে জীবনকে ছড়িয়ে দিয়েছে। কল্যাণকুমার থেকে জগদীশ, প্রেমদাস থেকে সমর—সবারই সে একজায়গায় আকর্ষণ, উত্তেজনা। অথচ অনুপমার পথ চলা শান্তির জন্য—ভাই প্রেমদাসের কাছে তার প্রার্থনা···"শান্তির পথ আমায় বলে দিন।" অনুপমা মালতীর মতো তথাকথিত প্রগতিবাদিনী নয়, অথচ অনুপমার সব জিজ্ঞাসাই প্রকারান্তরে তার আত্মজিজ্ঞাসা, তার অস্তিত্বের মৌল জিজ্ঞাসা। অনুপমা শান্তি চেয়েছে 'প্রেমের শান্তি'। অনুপমাকে এ শান্তি দিতে পারেনি কল্যাণকুমার, দিতে পারেনি জগদীশ, প্রেমদাস বা সমরের কাছ থেকেও সে শান্তির পথের সন্ধান পায়নি। জগদীশ-অনুপমা-র দাম্পত্য সম্পর্কের সঙ্গে যতীন-মাধবীর দাম্পত্যসম্পর্কের মিল আছে। দুটি সম্পর্কই শব্দহীন, আনন্দহীন, জীবনতৃষ্ণা মেটায় না: "···অর্ধেক গেলাস জল খেয়ে বাকি ফেলে দিলে, জলের কোন স্বাদ নেই।" যতীনের সঙ্গে মাধবীর বিয়ের মতোই অনুপমা-জগদীশের বিয়েটাও হয়েছিলো হঠাৎ: "অনুপমার সঙ্গে জগদীশের আলাপ হয়েছিল ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীরে। অহেতুক আলাপ। বিবাহের কোন প্রস্তাব প্রথমে ছিল না।" ছোটবেলা থেকে মাধবীর মতোই একাকিত্বে কেটেছে অনুপমার—"অনুপমার সামাজিক জীবন ছিল স্বপ্ন। তার বাবার মতই, তার বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না।" তাই তার জগৎ গড়ে উঠেছিলো সাহিত্যকে, শিল্পকে নিয়ে—"অনুপমা··· ছিল নানা যুগের নানা দেশের কবি ঔপন্যাসিকগণের প্রেমকামনাক্ষুব্ধ বিচিত্র কল্প-জগতের অধিবাসিনী। পিতার লাইব্রেরীতে তার অবাধ গতি ছিল, যে কোন বই পড়তে, বইয়ের ছবি দেখতে তার বাধা ছিল না। চোদ্দ বছর বয়সে সে বার্টনের আরব্যোপন্যাস পড়েছে; আঠার বছর বয়সে মোপাঁসা, ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা শেষ করেছে; কলেজ-জীবনে টুর্গনিভ, সুডারমান্, ডি, এইচ, লরেন্স ছিল তার প্রিয় লেখক।" অনুপমার নিঃসঙ্গ জীবনে তার বাবার ছাত্র কল্যাণ-কুমার ছিলো প্রথম চমক—"মনে হত, কল্যাণ তাকে ভালবাসে।···অনুপমা চমকে ভাবত, সে বুঝি কল্যাণকে ভালবাসে।" কল্যাণের সঙ্গে এ প্রশ্নের মীমাংসা তার কোনদিন হয়নি। জগদীশও জানতে পারেনি অনুপমা তাকে ভালোবাসে কি না। যদিও অনুপমার মত নিয়েই তার মামা জগদীশের সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাব এনেছিলেন। জগদীশ নিজের সম্পর্কে জানে অনুপমাকে সে গভীরভাবে ভালো-

বাসে। অনুপমার সৌন্দর্য তাকে মোহিত, আবিষ্ট করেছে: "যে অপরূপ নারীসৌন্দর্যে সে মন্ত্রমুগ্ধ…"। অনুপমার ট্রাজেডি তার একাকিত্ব। ছোটবেলা থেকে লালন করা নিঃসঙ্গতাকে সে জগদীশ, কল্যাণকুমার বারো দ্বারাই ভরিয়ে তুলতে পারেনি। তাই সে সবার সহযাত্রিণী—একটা দূরত্বের অবকাশ তার সঙ্গে সবারই। গভীর পিপাসায় সে আর্ত, নির্জনতার আক্রমণে ভেতরে ভেতরে বিধ্বস্ত-অশান্ত: "আলো নিভিয়ে অনুপমা জানলা সব খুলে দিলে। জর্জেট শাড়ী ছেড়ে শান্তিপুরে শাড়ী পড়লে। মাথার চুল খুলে দিলে। এ ছোট কমপার্টমেণ্টে তার যেন দম আটকে আসছে।"

তথাপি মণীন্দ্রলাল কোনো নেতিবাচক পরিণামে কথনোই পৌছতে পারেননি। জীবন সম্পর্কে তাঁর শিল্পীর সানুরাগ প্রীতিই সম্ভবত তাঁকে কোনো অসুন্দরের পায়ে মাথা নোয়াতে দ্যায়নি। জীবন এবং প্রেম সম্পর্কে একটা জায়গায় তিনি আদর্শবাদী। যৌনতার প্রসঙ্গ এনে কখনোই তিনি প্রেমভাবনাকে দেহাশ্রয়ী করেননি, অথচ দেহাশ্রয়হীন প্লেটনিক ভালোবাসাও তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য নয়। প্রেম এবং যৌনতাকে তিনি আশ্চর্য সংযমে বেঁধেছেন।—

"কল্যাণের কাঁধে ছোট বালিশ রেখে তার ওপর অনুপমা মাথা রাখলে। চোখ বুজে সে বললে, এমনি মাথা উঁচু করে শুয়ে থাকি, তা হলে কাশি আসবে না—তুমি চুপ করে বসে থাক, যেও না। এবার একটু ঘুম আসছে।

কল্যাণ বাক্যহারা হয়ে বসে রইল। অনুপমার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু সে অনুভব করছে, সদ্য-ফোটা শিশিরভেজা শ্বেতপদ্মের মত সে মুখ শান্ত স্নিগ্ধ নির্মল।"

আধুনিক পাশ্চাত্যায়নের মূল জায়গা দুটি বলে মণীন্দ্রলালের ধারণা—Sex আর Property সহযাত্রিণীতে এই দুটির প্রসঙ্গ দু'বার এসেছে। একবার, দেবপ্রিয় ও প্রেমদাসের বিতর্কে—

"সন্ন্যাসী বলছেন, দেখ দেবপ্রিয়, তুমি যে সমস্যা বলছ, তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—প্রেম।…মানুষের মধ্যে নানা কামনা, বাসনা রয়েছে—

—তাদের মধ্যে দুটি কামনা সবচেয়ে প্রবল, ইংরেজীতে বললে কথাটা স্পষ্ট হয় - Sex and Property.

—অর্থাৎ সৃষ্টিরক্ষার জন্য নারীরূপিণী প্রকৃতির সুন্দরী মায়া, আর স্থিতির জন্য শক্তি ও সম্পদসঞ্চয়। কি বল?

—শেষটা বললেন না, নারীর জন্য, সম্পদের জন্য শক্তির সংঘাত—প্রলয়!"

দ্বিতীয়, মালতীকে সমর বলছে—"দেখ, Sex আর Property, এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের সকল বেদনা, বাসনা, সংঘাত, সংগ্রাম—"

এই দুই জায়গার কাছে বিভিন্ন সময়ে হার মেনেছে প্রেমদাস, দেবপ্রিয়, রাধাকান্ত, কনক, গণেশ, জগদীশ, এমন কী কল্যাণকুমার। তাই "সন্ন্যাসীর দীর্ঘ বিপুল পৃষ্ঠ দেখাচ্ছে যেন হলুদবর্ণের কোন অজানা জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে।" প্রেমদাসের মনে হয়, "…এ প্রেমের ধর্ম, সেবার ধর্ম আর নয়, শক্তির ধর্মকে জাগাও, জাগ্রত কর উদ্দীপ্ত কর হ্লাদিনী শক্তিকে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে সর্পিল বিদ্যুন্মালার চকিত দীপ্তিতে উচ্ছল কালিন্দী তীরে কম্পিত অন্তরে রাধিকার অভিসার নয়; অমাবস্যার তামসী রাত্রে ভৈরবীচক্রে ভৈরবীকে আহ্বান কর, পরমাসুন্দরী নারীর অপরূপ লাবণ্য এ অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যাক, মহাশক্তির উদ্বোধন কর, মুণ্ডমালিনী কালিকার নৃত্য শুরু হোক।…

যা দেবী সর্বভূতেষু রূপরতীরূপেন সংস্থিতা—অনুপমারূপেন—মোহিনীশক্তি-রূপেন অপরূপ সৌন্দর্যরূপেন—"

অথবা, "আবেগের সঙ্গে দেবপ্রিয় আবার উঠে দাঁড়াল, বলে উঠল, কি সুন্দর তোমার তনু, নারী! পরিপূর্ণা সুন্দর নারীকে দেখতে ইচ্ছে করে—জানতে ইচ্ছে করে তার রূপের রহস্য, জানতে ইচ্ছে করে সে রূপ যখন যুবতী-তনুতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত বিকশিত হয় তখন তার মনে কি অনুভূতি কি বেদনা কি আনন্দ জাগে—হ্লাদিনী শক্তি নারীদেহে কি অপরূপ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়,—কেশের বর্ণে, ত্বকের লাবণ্যে, নয়নের তারকার জ্যোতিতে, গ্রীবার রেখায়, বক্ষের সুষমায়, কটির ভঙ্গীতে, চরণ-মৃণালের নৃত্যপরা ছন্দে!"

এদের সবার থেকে ব্যতিক্রম সমর। সমরের মতো আদর্শবাদী প্রাণপূর্ণ চরিত্র মণীন্দ্রলালের লেখায় আর একটিও নেই। সময়ও স্বপ্নালু, তবে তার স্বপ্ন সোস্যালিজমের স্বপ্ন।—"আগামী যুদ্ধে পৃথিবী-জোড়া ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ভেঙে চুরমার হয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন সমাজ গড়ে উঠবে—কম্যুনিজ্‌ম্!…এখন সবাইকে ভাঙনের কাজে লাগতে হবে।" সমরের কাঁচা বয়সের তরুণ আবেগ মনে পড়িয়ে দ্যায় 'ঘরে বাইরে'র অমূল্য বা 'রক্তকরবী'র কিশোরকে যারা তাদের নবীন হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলো বিমলা বা নন্দিনীর কাজে। তারাও রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ, কিন্তু মূলত মানবিক সংরাগে রঙীন। কিশোর নন্দিনীকে বলেছিলো "ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে

দেব।" রাজা বলেছিলো কিশোর সম্পর্কে "সে-যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।···বুদ্বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে হয়ে গেছে।" বিমলাও অমূল্যকে তার আত্মত্রাণের পাবক 'নারায়ণ' বলে মেনেছিলো। সমর কিশোর বা অমূল্য-র থেকে পরিণত ও বাস্তবমুখী তথাপি তারও সমর্পণ মালতীর কাছে নয়, অনুপমারই কাছে—"দিদি তোমার বুকে এমন করে মাথা রাখলে ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ঘুমোলে আমার চলবে না।" তাই সমরও অনুপমার জীবনে আনতে পারে অমর্তা-বিভা। সমর ভাবীকালের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলতে চায়, আইডিয়ালের জন্য সে-ও পারে অমূল্য-কিশোরদের মতো আত্মবিসর্জন দিতে—

"আইডিয়ালের জন্য সংগ্রামেতেই শান্তি।

—সংগ্রামে শান্তি।

—হ্যাঁ দিদি, তা না হলে কেউ কি প্রাণ দিতে পারত?"

৭

মণীন্দ্রলাল 'রমলা'র মতোই সহযাত্রিণীর নামও অনুপমা দিতে পারতেন, তাহ'লে অনুপমার একাকিত্ব আত্মজিজ্ঞাসা এত তাৎপর্যদ্যোতক হয়ে উঠতে পারতো না। মালতীর মতো তথাকথিত প্রগতিবাদিনী না হয়েও অনুপমা অনেক বেশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী। সমস্ত চলতমানতার মধ্যে অনুপমা একটা জায়গায় স্থির, আত্মমগ্ন ও স্বতন্ত্র: "সে অনুভব করলে, ট্রেন ছুটে চলেছে, অবিরাম ঘূর্ণ্যমান লৌহচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি বড় কর্কশ; ছুটে চলেছে চঞ্চল যাত্রীদল, তাদের পদধ্বনি বড় ব্যথা-ভরা; ছুটে চলেছে সৈন্যদল কামান-গাড়ী টানতে টানতে, তাদের অন্তর্ঝঞ্ঝনা কি উন্মাদক; অনন্তগগনে ছুটে চলেছে লক্ষ লক্ষ গ্রহতারকা, কি জ্যোতির্ময় এ পথ! এ অবিরাম গতিস্রোতে স্থির বিন্দুর মত সে বসে।"

জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিধারক মণীন্দ্রলাল শেষ পর্যন্ত অনুপমা-জগদীশের সম্পর্কেও আপাত শান্তির সন্ধান দিয়েছেন মাধবী-যতীনের সম্পর্কের মতো। সমুদ্রতীরের বাড়িতে, সাগরের ধারে বসে ঢেউ-গোনার আশায় পরিসমাপ্ত অনুপমার জীবন। সমস্ত সহযাত্রার বেগ তখন স্তিমিত, অনুপমার এবার নিজের মধ্যে নিজেকে চেনার পালা।

১৩৬৭ সালে প্রবাসীর ষষ্ঠ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য যে স্মারক-গ্রন্থ বেরুলো

তাতে বেরুলো মণীন্দ্রলালের উপন্যাস 'এষণা'। উপন্যাসটির সঙ্গে পত্রিকার পাতায় ছিলো কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের ছবি। বই হয়ে এষণা বেরুলো ১৯৭২-এর বৈশাখে। মুদ্রিত গ্রন্থে কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের ছবি নেই, লেখক তুলে দিয়েছেন পরিচ্ছেদ বিভাজন। সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীটিই যে একই এষণার স্তরান্তর এটাই প্রমাণ করা হয়তো লেখকের উদ্দেশ্য ছিলো। চন্দ্রশেখর বা শেখরের জীবনব্যাপী এষণা বা অনুসন্ধানের কথাই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় উপজীব্য। এ খোঁজার শেষ নেই—"হায়! এ এষণার শেষ কোথায়!"

উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য এর উপস্থাপন ও ভাষাশৈলী। ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে যাওয়ার বেগ সমগ্র অনুসন্ধানকে একটি অখণ্ডতা দিয়েছে। গদ্যে লেখক নিয়েছেন চলিত রীতির আশ্রয়। কিন্তু সেই গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগে, ইংরেজি ফরাসী উদ্ধৃতি ও ব্যবহারে। 'রমলা'র রূপদক্ষ ভাষাশিল্পীর এ এক নতুনতর পরিচয়।

৮

মণীন্দ্রলালের রচনায় মাঝে মাঝে এসে পড়েছে এক মৃত্যুময়তা বা morbidity। কল্লোল-যুগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন "এই সময়টায় আমরা মৃত্যুর প্রেমে পড়েছিলাম।"—"সেই 'মৃত্যুর প্রেম' আর 'নরনারীর প্রেম' ছুয়ে মিলে এক বিচিত্র রসের সৃষ্টি করেছে মণীন্দ্রলালের রচনায়।" (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য—ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃ ২৪০)। মণীন্দ্রলালের নায়করা অনেকেই মৃত্যুকে বরণ করেছে। বিপ্লব বা যুদ্ধে দিয়েছে আত্মাহুতি। যেমন 'অরুণ' (মায়াপুরী) বা 'অশোক' (রক্তকমল)। আদর্শবাদ এবং বিপ্লব এদের মাতিয়েছে। প্রেমের বিপরীতে জীবনের আরেকদিকে তারা প্রস্তুত করেছে নীরস কর্তব্যের পটভূমি। জীবনের প্রেম আর মৃত্যুর প্রেম তাদের জীবনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গ্যাছে—"মেয়েরা চিরকাল আমার কাছে রহস্য। তাদের বুঝতে চাইনি শুধু তাদের প্রেমের স্পর্শে জীবনটাকে বাজিয়ে চলেছি।" [অশোক (রক্তকমল)] আবার, "এই প্রলয়ের অগ্নি-উৎসবের রাঙা আলোয় কোন তরুণীর মুখ চমকে চমকে ভেসে উঠেছে।" [অরুণ (মায়াপুরী)]। আবার সুকান্ত-র [সুকান্ত (মায়াপুরী)] মতো নায়কেরা যক্ষ্মারোগে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যুর আবির্ভাবকে জীবনে অনুভব করেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি সুকান্তর জীবনেও এসেছে প্রেম, বন্ধুর বোন ঊষাকে ঘিরে। সুকান্তর

কাছে জীবনশিল্প মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিশ্ব শিল্পের প্রতিবিম্বায়িত রূপ নিয়ে রঙে রসে ভরে উঠেছে। জীবন এতো যে ভালো, এ-ও যেন হাতে ছুঁয়ে এতকাল সে ছাখেনি—"বিশ্বশিল্পী এম্নি করে জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার প্রতিঘাতে প্রতি মানুষের জীবনের গল্প লিখে চলেছে…"। মৃত্যুময়তার এই গা ছমছমে পরিবেশ এ-ও রোম্যান্টিকতারই এক লক্ষণ—"When the first signs of the Romantic spirit appeared in the eighteenth century, the time-worn theme of the supernatural took a new character and received a new prominence. The fashionable cult of strangeness turned inevitably to this alluring world of the unknown and exploited it with a reckless carelessness. The result is that the ghosts and goblines crowd the Romantic poetry of Germany, and in England the spate of "Gothick" novels spent its none too abundant resources in trying to make the flesh creep with death-pale spectres and clarking chains". [The Romantic Imagination/C. M. Bowra/Pg 51]

ড সুকুমার সেন বলেছেন "মুমূর্ষু নায়কনায়িকা লইয়া ইঁহার কয়েকটি গল্পের প্যাথলজিক্যাল বা মৃত্যুশঙ্কিত পরিবেশ রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'মাসি' এই ধরণের গল্পের মূল আদর্শ।" মণীন্দ্রলাল বসু জানিয়েছেন তিনি কোনোভাবেই মাসির দ্বারা প্রভাবিত নন। বরং তাঁকে বিভাবিত করেছে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের 'শেষের রাত্রি'।[৯] ড. সেন-ও সম্ভবত মাসির কথা নয়, শেষের রাত্রির কথাই বলতে চেয়েছিলেন। শেষের রাত্রির প্রভাব মণীন্দ্রলালের উপর যে সত্যই গভীর ছিলো তারই প্রমাণ সহায়তায় এখানে পাশাপাশি দুটি গল্পাংশ উদ্ধৃত হ'লো।

(ক) "মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্ম-জন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভরে নিয়ে চললুম। আর জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।"

(শেষের রাত্রি—রবীন্দ্রনাথ)

(খ) "হাঁ, দাদামশাই, এ জন্মে তুমি আমার যা করেছ তার আমি কিছু শোধ দেবো, ছেলেবেলায় কবে যে বাপ-মা হারিয়েছি, কিন্তু তাঁদের অভাব কোন-দিন আমায় বুঝতে দাওনি—এবার তোমাকে আমি বুকে করে মানুষ করব।"

(ফাঁকি, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রবাসী ১৩৩১)

৯

মণীন্দ্রলাল বসু বাংলাসাহিত্যে যে Subjective Romanticism বা মনোময় রোম্যান্টিকতার সঙ্গে ব্যাপক ব্যবহার করেন তা কোনো বিচ্ছিন্ন একক প্রকাশ, না, তার পূর্বসূত্র বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ছিলো তার প্রসঙ্গে আসার আগে প্রথমেই এই সিদ্ধান্তটি জানিয়ে রাখা দরকার যে, মণীন্দ্রলালকে সবচেয়ে বেশি বাংলাসাহিত্যের মধ্যে প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ভাববিশ্ব মণীন্দ্রলালের জীবনদর্শনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, ভারতীয় দর্শনপ্রাণিত রবীন্দ্র-শিল্প বা সাহিত্যতত্ত্বের মতো মণীন্দ্রলালের সাহিত্যদর্শনও ছিলো আনন্দমুখী। রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো ভাবনা বা প্রতীক বা চিত্রকল্প অনেক সময়ে সরাসরি উঠে এসেছে মণীন্দ্রলালের রচনায়। দু'একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত হ'লো—

'পদ্মফুল'কে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ভারতীয় সাহিত্যে ধরা হয়। প্রেমের সঙ্গে বা হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে পদ্মকে অনেক সময়ে প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনায় মিলিয়ে দেওয়া হয়। মণীন্দ্রলাল 'রমলা'য় পদ্ম-প্রসঙ্গকে রজত-রমলার ক্রমবিকাশমান ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করেছেন—"গভীর রাত্রে রজত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাদা মার্বেলের টেবিলের উপর একটি রক্তপদ্ম! চন্দ্রের চাহনিতে পদ্মের পাপড়িতে পাপড়িতে যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, পদ্ম গন্ধে বর্ণে বিকশিত হইয়া উঠে, সেই সৃষ্টির বিকাশের আনন্দ সে তাহার দেহে মনে অনুভব করিতে লাগিল।" মনে পড়ে যায় 'মুক্তধারা'র কথা, যেখানে দুখনী ফুলওয়ালীর পদ্ম সঞ্জয় দিতে চেয়েছে—"আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।" ভক্তি তো ভালবাসারই আরেক পরিণাম।

(খ) জীবনায়নে অরুণের মানস-দিগন্তে নতুন সূর্যোদয় হয়েছিলো পুরীতে এসে। তাই তার কাছে দিনগুলো হয়ে উঠেছিলো নতুন মাদকতায় ভরা—"প্রতি-প্রভাতে সুনীল জলে আলো-ভরা দিন বিকশিত হইয়া উঠে শ্বেতপদ্মের মত, কে যেন সোনালী খাম খুলিয়া একখানি নীল চিঠি অরুণের হাতে দিয়া যায়;…" 'ছিন্নপত্রে'র পর্বে শিলাদহে এসে রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিলো প্রতিটি দিনই যেন নতুনের আশ্বাস নিয়ে আসছে—লেফাফা খুলে তিনি যেন কী অপূর্ব চিঠি পাবেন।

(গ) সূর্যাস্ত প্রসঙ্গে মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—অভিজিতের

সংলাপে—"ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের ছবি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে।" মুক্তধারার এক বছর পরে লেখা হ'লো 'রমলা'। মণীন্দ্রলাল অস্তসূর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন —"যেন কোন নীড়-হারা পথিক-বিহঙ্গ দুই রাঙা ডানা মেলিয়া দিনশেষে রাত্রির অনন্ত তারা-লোকের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে।" 'যন্ত্ররাজ', 'প্রলয়ঙ্করের ডমরুধ্বনি'—এইসব বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগেও মুক্তধারার প্রভাব ছাখা যায়। মৌল ভাবনার ক্ষেত্রে মুক্তধারাতে যেমন যন্ত্রসভ্যতাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে, অভিজিতের অস্তিত্বের মুক্তধারাকে লোহার বেড়ী দিয়ে বেঁধে ফেলতে চাওয়া হয়েছে, মণীন্দ্রলালের 'রমলা'তে যতীনের নিছক যন্ত্রোপাসনাকে মনে হয়েছে 'শক্তির ব্যভিচার'। যন্ত্রসভ্যতা, হৃদয়হীন পাষাণ-সভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার—মুক্তধারা আর রক্তকরবীতে। এ দুয়ের মাঝখানে 'রমলা'—এখানে যান্ত্রিকতার মোহ থেকে প্রাণের আনন্দরূপ বিকাশে জীবনের মাধুর্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কবিতায়, তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অধ্যাপক' প্রভৃতি গল্পে যে মন্ময় রোম্যান্টিকতার প্রকাশ তারই আরেক রূপ মণীন্দ্রলালের রচনায়। 'মানসী,' 'সোনার তরী' 'চিত্রা' পর্বের বিমূর্ত আবেগকে মণীন্দ্রলাল মূর্তায়িত (concrete) রূপ দিয়েছেন। শিল্পের একটা অন্তর্নিহিত ভাবস্পন্দন মণীন্দ্রলালের রচনায়। ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিকরা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন গভীরভাবে। টমাস মূরের রচনা এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র তুলনার কথা নিজে বলেছেন মণীন্দ্রলাল।[১০] মণীন্দ্রলাল এসে একদিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের রোম্যান্টিকতা আরেক দিকে রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতা সমীকরণে নতুন রোম্যান্টিক ভাবধারার জন্ম দিয়েছে। 'যুগান্তরের তৃষ্ণা' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮) বিশেষভাবে মনে করিয়ে ছায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকে। 'খেয়াঘাটে'-তে (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮) যেন কীটসের শেষকালীন জীবনের কথা।

মণীন্দ্রলালের রচনায় যে নব্য রোম্যান্টিক ধারা তার প্রসঙ্গে রবীন্দ্ররচনার পাশাপাশি মনে পড়ে প্রথম চৌধুরীর রচনা ('চারইয়ারিকথা'য় ইটারন্যাল কেমিনিনের প্রসঙ্গ), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনে মনে' (এর আব্‌ছা আভাস মণীন্দ্রলালে 'সুকান্ত'-এ), সীতা দেবীর 'চোখের আলো', 'পথের দেখা', শান্তা দেবীর 'সুনন্দা'—এই রচনাগুলির কথা। এছাড়া বিশেষভাবে বলতে হয় তাঁর সুহৃদ সুধীরকুমার চৌধুরী (১৯১৭-এ প্রথম গল্প বেরয় এঁর—'প্রহসন') এবং হেমেন্দ্রলাল রায়ের কথা। মণীন্দ্রলালের 'জন্মজন্মান্তর' আর হেমেন্দ্রলালের

'বিদ্রোহী' ('মায়ামৃগ' সংকলনের অন্তর্গত) পাশাপাশি রেখে পড়া যায়— —"অন্ধকার—অন্ধকার—মেঘলা রাত্রির অন্ধকার হ'তেও গাঢ়-সমুদ্রের বুকের ভিতরকার অন্ধকার হ'তেও নিবিড়! কানে ন্যাগ্নির বুক-ফাটা আর্তনাদের ধ্বনিটা তটের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ক'রে আছড়ে পড়ছে।—নীলা—নীলা—নীলা···" মণীন্দ্রলালের প্রভাব তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আরো একজনের উপর গভীরভাবে পড়েছিলো, তিনি গোকুলচন্দ্র নাগ। এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কল্লোলযুগ এ বলেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—"নিজের সম্বন্ধে বলতে এত অনিচ্ছুক ছিল গোকুল। পরের কথা জিজ্ঞাসা করো, প্রশংসায় একেবার পঞ্চমুখ।"

গোকুলচন্দ্র নাগ, আর তাঁর বন্ধুরা—দীনেশরঞ্জন দাশ, সুনীতি দেবী এবং মণীন্দ্রলাল বসু মিলে গঠন করেছিলেন 'ফোর আর্টস ক্লাব' বা শিল্প চতুরঙ্গ গোষ্ঠী। ফোর আর্টস ক্লাব থেকে বেরিয়েছিলো একটি গল্পের বই 'ঝড়ের দোলা' নামে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন "কল্লোল-এর অগ্রদূতরূপে ১৯২২ সালে 'ঝড়ের দোলা' বার হয়।" এই ফোর আর্টস ক্লাব এবং ঝড়ের দোলা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন—"গোকুল এবং তার বন্ধুদের 'ফোর আর্টস ক্লাব' নামে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। বন্ধুদের মধ্যে ছিল দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু আর সুনীতি দেবী।[১১] এরা চারজনে মিলে একটা গল্পের বইও বের করেছিল, নাম 'ঝড়ের দোলা'। প্রত্যেকের একটি করে গল্প। মাসিক পত্রিকা বের করবারও পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার আগে ক্লাব উঠে গেল।" মণীন্দ্রলালের গল্পের নাম ছিলো 'শ্রীপতি'। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—"আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে শ্রীপতি। এই গল্পটির মধ্যে আগাগোড়া যে লঘু কৌতুকের সুর বাজিয়াছে, সেটুকু বেশ উপভোগ্য।"

গোকুলচন্দ্র নাগের রচনায় মণীন্দ্রলালের প্রভাব আছে। আবার মণীন্দ্রলালের রচনার মৃন্ময় পটভূমি-নির্মিতিতে গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুর প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করবেন।[১২]

পরবর্তীকালের লেখকের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ('নীলাঙ্গুরীয়' দ্রষ্টব্য)-এর রচনায়, বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'অকর্মণ্য'-এ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায়, বনফুলের 'কিছুক্ষণ'-এ (সহযাত্রিণীর সঙ্গে তুলনীয়) মণীন্দ্রলালের প্রভাব ছাখা যায়। তবে মণীন্দ্রলালের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। ড. সুকুমার সেন এঁদের দুজনের তুলনা

করেছেন সবচেয়ে সার্থকভাবে।

"শ্রীযুক্ত' মণীন্দ্রলাল বসুর রচনার সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) রচনার স্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্য আছে। দুজনেই সমান ভাবুক এবং অন্তর্মুখ। দুইজনের গল্প উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যেন একই জগতের জীব। তফাৎ এই যে মণীন্দ্রবাবুর পাত্রপাত্রী শহরবাসী ধনী ও সংস্কৃতিমান, আর বিভূতিবাবুর পাত্রপাত্রী পল্লীবাসী দরিদ্র ও সাধারণ শিক্ষা (বা অশিক্ষা) প্রাপ্ত। মণীন্দ্রবাবুর নায়কের ঠিক বিপরীত বিভূতিবাবুর নায়কেরা।··· মণীন্দ্রলালবাবুর রচনায় শহরের ভিলায় সযত্নরোপিত মূল্যবান বিলাতি লতাগুল্ম মৌসুমী ফুলের বাহার, আর বিভূতিবাবুর রচনায় পাড়া-গাঁয়ের পল্লীপথের বাঁকে বাঁকে নাম-না-জানা-গাছ আগাছার ঝোপ।···" ড সেন এই তুলনার অনুষঙ্গে পরপর দু'জনের লেখা থেকে যে অংশ দুটি উদ্ধৃত করেছেন সে দুটি হলো—

"তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিগোনিয়া ফুলের মত রাঙা মুখ ঘেরিয়া কালো কেশের রাশি; তাহার উপর কিউমিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রং-এর জামার ওপর এষ্টার ফুলের রং-এর একখানি সাড়ি। মোজাবিহীন পায়ে ক্যাক্টাসের মত লাল ভেলভেটের চটিজুতো।"

['দার্জ্জিলিং-এ', মণীন্দ্রলাল বসু, 'ভারতবর্ষ' কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮]

এবং

"পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু কালকাসুন্দা ধুতুরা কুঁচকাঁটা আর ঝুমকোলতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ঝোপমত তৈরী করেছে। শীতল হেমন্ত-অপরাহ্নের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে। এমন একটা মিষ্ট নির্মলগন্ধ গাছগুলো থেকে উঠেছে, এমন শ্যামল শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটির যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চলপ্রান্তের মত।" [উপেক্ষিতা, মেঘমল্লার]

বিভূতিভূষণের 'উপেক্ষিতা' গল্পটি যখন 'মেঘমল্লার'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এই পরিচ্ছেদটি বাদ স্থান লেখক:

"আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু উর্দ্ধে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে; হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের

হাওয়ার মতো তাঁদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্য্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা-বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াচ্ছেন;—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিদিতে দেখতে পেলুম।" [প্রবাসী মাঘ, ১৩২৮]

হয়তো এ পরিবর্তন উদ্দেশ্যচালিত; কারণ রচনায় মণীন্দ্রলালের সঙ্গে সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট।

১০

মণীন্দ্রলাল বসুর রচনার মূল বিভাবনটি হ'লো প্রেম। নরনারীর সম্পর্কের নানা রহস্য, আকর্ষণ, দ্বন্দ্বই তাঁর রচনায় বারবার ফিরে এসেছে। তিনি জন্মজন্মান্ত-ব্যাপী এক জীবন থেকে জীবনান্তর-অতিক্রান্তী অনন্ত প্রেমের ভাবনায় বিশ্বাসী। তাই তিনি বলেন "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল।" বলেন—"এই প্রিয়াকেই কি সে কতরূপে কতবার যুগে যুগে অনিবার অনন্তলোকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছে?" স্বভাবতই মনে পড়ে আমাদের 'মানসী' কাব্যের 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটির কথা—এ যেন তার গদ্যানুবাদ।

ভালোবাসার অজস্র বিচ্ছুরণের কথা বললেও মণীন্দ্রলাল কিন্তু আশ্চর্যরকমের সংযমী ও একনিষ্ঠ। প্রায় এ অর্থে তাঁকে আদর্শবাদী বলা যায়। অনেক সময়েই একটি দুটি বর্ণনায়, কথনো বা প্রতীকে তিনি ভালোবাসার শারীরবিকাশকে বলে ছান, কখনো আদৌ বলেনই না। রূপের সমুদ্রে ডুব দিয়েও অরূপরতনই তুলে আনেন। প্রেম ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই মতো বৈষ্ণবীয় আদর্শে বিশ্বাসী, মানসস্ফুরণে আস্থাশীল। প্রিয়ার প্রসঙ্গে মানস সুন্দরী, সৌন্দর্যলক্ষ্মী, উর্বশী ইত্যাদি রবীন্দ্রপ্রাণিত শব্দ তিনি অনায়াসে গ্রহণ করেন, কখনো বা ব্যবহার করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের টুকরো অংশ, ওমর খৈয়ামের রুবাই। কল্লোলের প্রাক্ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও কল্লোলীয় যৌনচেতনা তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। এইদিক থেকে তিনি কল্লোলীয় জীবনচেতনার থেকে বিচ্ছিন্ন—যদিচ যৌবনের জয়সঙ্গীত তিনি উচ্চকণ্ঠে গেয়ে গ্যাছেন। তাঁর যৌবনভাবনাও অন্তর্মুখী ও শিল্পচারী। এদিক থেকে তিনি কল্লোল ভাবনার বিরোধী।[১৩] এবং তাঁর রচনা একটা জায়গায় পূর্বাপর ধারার সঙ্গে সম্পৃক্তিহীন, যোগশূন্য যদিও নয়—খানিকটা তাঁর নায়কদের মতোই গম্ভীর গোপনে নির্জন, নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ববাহক।

মণীন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বাস্তববিমুখ, পলায়নবাদী। মণীন্দ্রলালের

রোম্যান্টিক সৌন্দর্যবিলাসই এরকম ধারণার সহায়ক। মণীন্দ্রলাল রোম্যান্টিক বটে, কিন্তু বাস্তবতাবোধহীন পলায়নকামী নন। কখনো কখনো তাঁর বাস্তব জীবনবীক্ষা সূচীতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—একটি বা দুটি বজ্রগর্ভ লাইনে তিনি স্পর্শ করে যান সচেতন পাঠকের মন। যেমন, ধরা যাক্, মামাবাবুর মৃত্যুর পর রজত-রমলা সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আর্থিক অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে দাম্পত্যজীবনের একঘেয়েমি ও গ্লানিকে অস্বীকার করেননি।—

"রমলা বিছানায় গিয়া শুইতে পারিত না, মেজেতে দোলনার পাশে মাদুরে শুইত, ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিত। এই কি জীবন? প্রথম যৌবনে বোর্ডিং ঘরে কত জ্যোৎস্নারাত্রে জীবনের কত রঙীন স্বপ্নজাল বুনিয়াছে, আর কিছুদিন পরে তাহার সহিত নিচেকার উমার জীবনধারার কোন প্রভেদ থাকিবে না। সব দুঃখকে সব অবস্থাকে কি মানিয়া লইতেই হইবে?

কেন এমন হইল? হয়ত তাহার জীবন অন্যরূপ হইতে পারিত। সে যেন বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, যেন পাথরচাপা অন্ধকার গহ্বরে ঝর্ণাধারার মত ছটফট করিতেছে।

কে ইহার জন্য দায়ী?…"

অথবা সহযাত্রিণী-তে তথাকথিত প্রগতিবাদিনী মালতী মল্লিক যখন একা একা ট্রেনে যাওয়ার সময়ে বাড়ীর কথা, মায়ের কথা অবশ্যম্ভাবীভাবে ভাবে, তখন তার এই ক্ষণিক ভাবনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে তার গৃহগত মধ্যবিত্ত মেয়ের সেন্টিমেন্ট—

"মায়ের রান্না বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। আজ আর বেশি রাঁধবেন না। ছোট ভাইপো মনু বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। আসবার সময় তার মা চক্ষের জল কষ্টে রোধ করেছিলেন, কিন্তু মনু চীৎকার করে বাড়ী মাৎ করে দিয়েছিল।

মা যদি অবুঝ হন কি করা যায়। তার জীবনের আদর্শকে সে কত বোঝাতে চেষ্টা করেছে, মা কিছুতেই বোঝেন না; বলেন, গরীব দুঃখীর সেবা করতে চাও, খুব ভাল, কিন্তু সেজন্য বিয়ে না করে টো টো করে ঘোরা কেন! আজ রাতে মায়েরও ঘুম হবে না! মাকেও একটা চিঠি লিখতে হবে ট্রেন থেকে।

মালতীর ইচ্ছা হ'ল, সমরের সঙ্গে মায়ের গল্প আরও করে। কিন্তু সঙ্কোচে সে চুপ করে রইল। সোসিয়ালিজ্‌ম—মন্ত্রে সে দীক্ষিতা। হৃদয়ের কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করলে চলবে না।"

তবে নিষ্ঠুরতম বাস্তবকে মণীন্দ্রলাল সম্ভবত প্রকট করেছেন 'মায়াপুরী' সংকলনের অন্তর্গত তাঁর 'মা' গল্পে। গল্পটি মাতৃহৃদয়ের একটি সন্তানকে কেন্দ্র করে আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তারপর সন্তানের অসুখ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেই আশা ভেঙে পড়ার কাহিনী। প্রতিবেশী ডাক্তারের কথা আড়াল থেকে শুনে বিভা বুঝতে পারে তার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে তার স্বামীর পাপের ফলে। বিভা বিভ্রান্ত হয়ে যায়—চা-বাগানে কর্মরত প্রবাসী স্বামী বাড়ি এলে তার শয্যায় অংশ নিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাধ্য হয় সে স্বামীর ইচ্ছার কাছে। গল্পটির শেষ লাইনটি ট্র্যাজিক শলাকার মতো—"বিভা রোজ তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া প্রণাম করিয়া বলে, ঠাকুর, এবার যেন আমার মরাছেলে হয়।"

মণীন্দ্রলাল তাঁর সাহিত্যে একটি নৈতিক মানদণ্ডকে আগাগোড়া বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। প্রবাসী পত্রিকায়ই প্রধানত তাঁর প্রথম দিককার বেশির ভাগ লেখা প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর moral standard বা নীতিগত মাপকাঠির কথা মনে রেখেই তিনি তাঁর সাহিত্যের নীতিমূল্য নির্ধারণ করেছিলেন হয়তো।[১৪] তাঁর লেখায় একটি স্বাভাবিক পবিত্রতার সুর—"আমার লেখায় কোন নীতি-প্রচার বা ধর্মের ব্যাখ্যান না থাকিলেও তাহার শুচিতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিবেন না।"

১১

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা হয়েছিলো 'অবন ঠাকুর ছবি লেখেন।' মণীন্দ্রলাল সম্পর্কেও বলা যায় তিনি তাঁর সাহিত্যে ভাষা দিয়ে ছবি আঁকতে চেয়েছেন। তাঁর এক একটি বর্ণনা রূপে, রঙে এক একটি বর্ণিল ছবি হয়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর চলিতভাষার ফ্রেমে রাবীন্দ্রিক শব্দ-সুষমার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রময় গদ্য বাংলাসাহিত্যে এনেছে এক নতুনতর বর্ণাঢ্যতা। মণীন্দ্রলালের গদ্যে ঘটেছে এ দুয়ের সম্মিলন বা সমন্বয়। এছাড়া, মূল প্রেরণাকেন্দ্রে যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দাঁড়িয়ে আছেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে। মণীন্দ্রলালের বর্ণনার পর বর্ণনা—মনে হয় ছবির পর ছবি। বারবার যে-সব শিল্পীর তিনি প্রসঙ্গ আনেন—রসেটি, র‍্যাফেল, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, ওয়াটস, টার্নার, অজন্তার শিল্পীরা, তাঁদেরই চিত্রময়তা যেন প্রসাদগুণ লাভ করেছে তাঁর রচনায়। ওয়াটসের 'হোপ' বা 'আশা' ছবিটির কথা মোট তিনবার এসেছে তাঁর রচনায়—দুবার রমলায়, আর একবার জীবনায়নে ['রমলা'—১৬ ও ২৬ পরিচ্ছেদ; জীবনায়ন—১৪

পরিচ্ছেদ]। মণীন্দ্রলালের মতো কাব্য-উচ্ছ্বাসপূর্ণ, চিত্ররূপায়িত, লাবণ্যময় ভাষার ব্যবহার খুব কমই দ্যাখা যায়। তিনি কেবল ভাষাশিল্পী নন, তিনি স্রষ্টা —রসগ্রাহী, আনন্দতীর্থের পথিক। কাজী সাহেব রজতের ঝড়ের ছবিটিকে বলেছিলেন 'রং-এ তৈরী ঝড়ের গান', আর আমরা মণীন্দ্রলালের দেওয়া সেই ছবিটির বর্ণনাকে বলবো ভাষায় আঁকা ঝড়ের ছবি—এমন নিখুঁত, বিশদ বর্ণনা বিরল দৃষ্ট—"কালো কালো মেঘে আকাশ কালীতে ভরা, সাপের ফণার মত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার তলায় ছিপ্‌টি-মারা কালো ঘোড়ার মত নদীর জল দুলে ফুলে উঠ্‌ছে, দু'ধারে গাছের সারি দিশাহারা, জলে স্থলে ধুলো-বালিতে মেখে বাতাসে যেন রুদ্রের আবির্ভাব; আর একটা পাখী দুই সাদা ডানা মেলে তারি মধ্যে উড়ে চলেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত'-এর কথা। মণীন্দ্রলালের গদ্যে দ্যাখা যায় সেই অন্তর্লীন ছন্দপ্রবাহ। তিনি অনায়াসে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু কোথাও তা ভাষাকে গুরুভার না করে এক অনায়াস গতি দেয়। শ্বাসযন্ত্রের স্বাভাবিক বিরতি ছন্দের প্রয়োজনে সহজেই হ্রস্ব বা বিলম্বিত হতে পারে। আসলে, ধ্বনির নির্দেশ শ্বাসযন্ত্রকে মানতে হয়। ছন্দহীন অতিদীর্ঘ পংক্তি পাঠেও আর কোথাও শ্বাস-যন্ত্রের সাহায্যে ছন্দনির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। সে প্রমাণের জন্যেই আমরা গদ্য কবিতা বা prose-poem থেকে উদ্ধৃতি দিইনি, বিশুদ্ধ গদ্য গ্রহণ করেছি। যতি যে ধ্বনিগুচ্ছকে রণিত করে তার নিদর্শন পরীক্ষা করা যাক—

"চৈত্র সন্ধ্যার হাওয়ায় মাথার উপর শালগাছের পাতা সরে গেল, ছিন্ন মেঘ থেকে ঝরা জ্যোৎস্নার আলো বীণার দুই কালো চোখে ঝরল—ঝর্ণাবুকে তারার দীপ্তির মত। সেই নিমেষের জন্য বীণাকে অপরূপ রূপে দেখ্‌লুম—বোধ হল জগতে এমন শ্রী আর নেই। দেখলুম চোখ-দুটি উল্কার আলোর মত, পিপাসায় ভরা; দেখ্‌লুম তার মুখখানি প্রেমারতির প্রদীপ; দেখ্‌লুম তার কণ্ঠে ও বক্ষে অনল দীপ্তি—নীলাম্বরী শাড়ি সেখান হতে খসে পড়েছে; আমি শুনলুম তার রক্তধারায় কিসের কান্না, তার চিত্তভরা বিরহ বেদনা—তরুণী তনুর উপর যেন কৈশোর যৌবনের দ্বন্দ্ব লেগেছে—আঁখিতে কি যাদুমন্ত্র, কণ্ঠে কি সুধা-ধারা, আঙুলে কি মাদক স্পর্শ, চরণে মোহন গতি, তনুভরা মধুর আহ্বান।· "

['অরুণ', মণীন্দ্রলাল বসু]

এই অংশটি এবারে গদ্য কবিতার আঙ্গিকে সাজানো যাক—

চৈত্র সন্ধ্যার হাওয়ায়
শালগাছের পাতা সরে গেল;
ছিন্ন মেঘ থেকে জ্যোৎস্নার আলো
ঝরল বীণার দুই কালো চোখে
ঝর্ণাবুকে তারার দীপ্তির মত।…"

এই ছন্দোময়, কবিত্বপূর্ণ ভাষার জন্য মণীন্দ্রলালের একটা স্থায়ী স্বীকৃতি আছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে। তাঁর অতিলৌকিক পরিবেশে স্থাপিত লেখাগুলির সূত্রে আমরা ভাবতে পারি এডগার-আলেন-পো-র কথা।

১২

মণীন্দ্রলাল বসু জন্ম নিয়েছিলেন এই কোলকাতা শহরেরই বুকে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন ১৮৯৭): "য়ুরোপীয় বণিক কোম্পানীর মুৎসুদ্দী সওদাগর কাশীনাথ ঘোষ উনবিংশ শতাব্দীর উদয়কালে মধ্য কলিকাতার বীডন-স্ট্রীট-নির্গত কাশী ঘোষের লেন ব্যাপী যে বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারি বৃহৎ প্রাঙ্গণ প্রান্তে এক ক্ষুদ্র গৃহে অন্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে আমার জন্ম হইয়াছিল…" তাঁর প্রমাতামহ ছিলেন সাংবাদিক ও বাগ্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যাঁর নাম 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বেঙ্গলী' পত্রিকা-র সঙ্গে যুক্ত এবং যিনি ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখার্জীর অন্তরঙ্গজন। মণীন্দ্রলালের রচনার যে ethics বা নীতিবোধ তার মূলে তাঁর মাতামহবংশের যথেষ্ট অবদান। মণীন্দ্রলালের প্রমাতামহী ছিলেন কোন্নগর (১৮৬৩) ও মেদিনীপুর (১৮৪৬) ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবচন্দ্র দেবের কন্যা। ফলে পুরুষানুক্রমে যে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গে মণীন্দ্রলালের মাতামহ-বংশের যোগ তাই ছিলো তাঁর 'সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক।' মণীন্দ্রলালের পিতৃবংশ চাঙ্গড়িপোতার বিখ্যাত বসু পরিবার। তাঁর কাকা ছিলেন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও শিল্পপতি কার্তিকচন্দ্র বসু। পৈতৃক ভিটে সম্পর্কে বলতে গিয়ে মণীন্দ্রলাল বলেছেন: "আমাদের চাঙ্গড়িপোতার ভদ্রাসনের সংলগ্ন ছিল 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্র সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুলালয়। এখন সে বাড়ীর কোন চিহ্ন নাই, শুধু পুরাতন সংবাদপত্রগুলি অতীতের সংবাদভারে জীর্ণ হইয়া আমাদের ভদ্রাসনের এক ক্ষুদ্র কক্ষে রক্ষিত।"

শিক্ষার জন্য মণীন্দ্রলাল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম বয়েজ ও ডে স্কুলে এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এই দুই বিদ্যায়তনে প্রবেশ তাঁর জীবনের দুটি 'টারনিং পয়েন্ট' এবং তাঁর সাহিত্যস্পৃহার উদ্বোধনভূমি। ১৯২৩-এ তিনি বি. এল. পাশ করেন। ১৯১৯-১৯২৫-এর মধ্যে লিখিত হয় তাঁর বেশির ভাগ গল্প ও দুটি উপন্যাস। ১৯২৫-এ তিনি বিদেশ যান। বিদেশযাত্রার সরস ও সহজ বর্ণনা তিনি লিখেছিলেন 'মৌচাক'-এ (১৩৩২)। "১৯২৫-১৯২৯ ইয়োরোপে বাসকালে কোন গল্প উপন্যাস লেখা হয় নাই, প্রথম বৎসরে ফ্রান্সের সমুদ্র তীরে বার্কপ্লাজে এবং পর বৎসরগুলি সুইজারল্যাণ্ডে পর্বতবেষ্টিত লেজাতে কাটিলেও বারবার লণ্ডনে যাইতে কোলন হইতে বুডাপেষ্ট—ইয়োরোপের নানা দেশ শিক্ষার্থীর মত পরিভ্রমণ করিয়াছি।...বস্তুতঃ ইয়োরোপের বৎসরগুলি আমার শিক্ষার কাল ছিল। শুধু লিঙ্কন্‌স্ ইনে ইংলিশ ল পাঠ নয়, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ফরাসী সাহিত্যে প্রবেশ, জার্মান সাহিত্য পরিচয়, আর বিশেষ করিয়া ইয়োরোপের নানা যুগের নানা দেশের চিত্রকরগণের অপূর্ব আর্ট নানা চিত্রশালা ঘুরিয়া দেখা।" মূলত ভারতবর্ষ পত্রিকায় (১৩৩৪-৩৬) তিনি এ-সময়কার চিত্রশালিকাগুলি ছাপার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

১৯২৭-এ ব্যারিষ্টারি পাশ করেন লণ্ডনের 'লিঙ্কন্‌স্ ইন'-থেকে। ১৯২৯-এ দেশে ফিরে এসে কোলকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। এই সময়ে জীবিকার পাশাপাশিই সারস্বতচর্চা চলতে থাকে—লেখা হয়, জীবনায়ন।

১৯৩৭-এ মণীন্দ্রলালের বিয়ে হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা সবিতার সঙ্গে। ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়ে পার্কসার্কাসের বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে মণীন্দ্রলাল চলে আসেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সবিতা বসুর কাকা প্রবোধচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে। ১৯৫২-এ গড়িয়াহাটের বর্তমান বাড়িতে তাঁরা চলে আসেন। মাত্র কয়েকমাস আগে (ডিসেম্বর, ১৯৮৪) মণীন্দ্রলাল হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে। এখন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের দিন কাটে বাড়িভরা বই, উননব্বই বছরের জীর্ণ শরীর কিন্তু আশ্চর্য তীক্ষ্ণ মেধা, স্মৃতি ও রসবোধকে আশ্রয় করে। আজকের মণীন্দ্রলালের শান্ত চেহারার দিকে, স্তিমিত বার্ধক্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে অবাক লাগে ইনিই সেই 'রমলা'র বিখ্যাত রোম্যান্টিক লেখক—যাঁর কলম উন্মাদনা জাগিয়েছিলো অনেক তরুণ-তরুণীর মনে। জার্মাণ অনুবাদে যাঁর গল্প পড়ে প্রশংসামুখর হয়েছিলেন রঁমা রঁল্যা।[১৫]

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাবাহিক চর্চায় যদি কেউ ইচ্ছুক হন, আজও তাঁকে 'কল্লোলচেতনা'র পূর্বসূরিত্বে মণীন্দ্রলালের যৌবনচঞ্চল গল্প-উপন্যাসগুলির কথা ভাবতেই হবে। রোম্যান্টিক স্বপ্ন-জগতের অদ্ভুত সৃষ্টি এগুলি, প্রতিটি ছত্রে যেন জীবন এবং ভালোবাসার উত্তাপ। হয়তো মণীন্দ্রলালের আত্মমূল্যায়ক কোনো উক্তি নিয়েও তিনি ভাববেন, এমন যথাযথ আত্মযাচাই খুব কমই হয়ে থাকে—"Graham Hough-এর মত কোন রসবন্ত সাহিত্যবিদ্ যদি এ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য-কথা লিখিতেন, আমাকে বোধ হয় The Last Romantic বলিতেন।" কেবল গ্রাহাম হাফ কেন, আমরাও কি তাঁকে তা-ই ব'লবো না?

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু : জীবন-সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি

জন্ম : কোলকাতা, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ ; ৮ই জুন ১৮৯৭।

পিতা : প্রবোধচন্দ্র বসু ; মাতা : ইন্দিরাসুন্দরী বসু (ঘোষ)

১৯০৬—১৯১৩ : ব্রাহ্ম বয়েজ ও ডে স্কুল, কোলকাতা।

১৯১৪ : হেয়ার স্কুল, কোলকাতা।

১৯১৪-২০ : প্রেসিডেন্সী কলেজ, কোলকাতা।

১৯২৩ : বি. এল. পাশ। এই বছরই 'রমলা' প্রকাশিত।

১৯২৪ : কোলকাতা হাইকোর্ট, উকীল।

১৯২৫ : ইয়োরোপ যাত্রা।

১৯২৭ : ব্যারিষ্টারী পাশ, লিঙ্কন্‌স্ ইন, লণ্ডন।

১৯২৯ : দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৭ : বিবাহ।

১৯৪১ : পিতার মৃত্যু।

১৯৪৬ : কোলকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পার্ক সার্কাস ভবন ত্যাগ। এই পার্কসার্কাসের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে একসময়ে থাকতেন সুধীরকুমার চৌধুরী।

১৯৫২ : গড়িয়াহাটের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ।

১৯৫৩-৬৬ : আইন অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজ কোলকাতা।

১৯৮৪ : স্ত্রীবিয়োগ।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু : রচনা-পরিচয়

গল্পগ্রন্থ

মায়াপুরী : ১৩৩০ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত। [সংকলিত গল্প, তাদের পত্রিকায় প্রকাশকাল এবং ওই পত্রিকাগুলির নামের সূচী এখানে দেওয়া হ'লো]

গল্প	পত্রিকা	সময়
অরুণ *	প্রবাসী	শ্রাবণ ১৩২৬
জন্ম-জন্মান্তর	”	ফাল্গুন ১৩২৭
সুকান্ত	”	মাঘ ১৩২৭
মা	”	পৌষ ১৩২৭
যুগান্তরের তৃষ্ণা	”	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮
পদ্মরাগ	”	ভাদ্র ১৩২৮
ফুলের ব্যথা		
মুকুল	ভারতবর্ষ	কার্তিক ১৩২৯
ব্লাউজ		
সব পেয়েছির দেশে	প্রবাসী	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
অশেষ	গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে লেখা	আশ্বিন ১৩৩০

* ১৩২৬ সালে প্রবাসী গল্প প্রতিযোগিতায় 'অরুণ' গল্পটির জন্য লেখক পুরস্কার পান। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন সুধীরকুমার চৌধুরী 'বাদুড়' নামক গল্প লিখে। 'স্বরণা' সম্পাদক প্রভাকর দাস তাঁর 'প্রদীপ' নামক গল্প লিখে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন।

রক্তকমল : ১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। [এখানেও আগের বইটির মতো আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া হ'লো]

গল্প	পত্রিকা	সময়
অশোক *	প্রবাসী	কার্তিক, ১৩৩০
নাগরিকা	”	কার্তিক, ১৩২৯
অতিথি	বঙ্গবাণী	কার্তিক, ১৩৩০
খেয়াঘাটে	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ, ১৩২৮
রেবতী	”	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮
বতন	ভারতবর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৩০

* ১৩৩০ সালের 'প্রবাসী' গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত। দ্বিতীয়-স্থান একযোগে লাভ করেন 'বিদ্রোহী' গল্পের লেখক হেমেন্দ্রলাল রায় ও 'মৌরীফুল' রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক ভট্টাচার্যও প্রফুল্লচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

সোনার হরিণ : ১৩৩১ সালের আশ্বিনে প্রথম প্রকাশিত [আগের মতো আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া হ'লো]

গল্প	পত্রিকা	সময়
দার্জিলিং-এ	ভারতবর্ষ	কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮
বেনামী	প্রবাসী	পৌষ ১৩২৮
অলকা	প্রবাসী	পৌষ ১৩২৯
সুধা	ভারতবর্ষ	কার্তিক ১৩৩০
সুরেশের মায়া *	বাঁশরী	১৩৩০

* ১৩৪৩ সালে জেনারেল প্রিন্টার্স থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়ে 'সুরেশের মায়া' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়।

কল্পলতা : ১৩৪১ সালের মাঘে প্রকাশিত [আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া হ'লো]

গল্প	পত্রিকা	সময়
মায়ের দিন	ভারতবর্ষ	১৩৩৭
বেহালা	অয়ন	
হোটেলওয়ালা	প্রবাসী	১৩৪০
লতিফের গান	চালচিত্র	আশ্বিন ১৩৩০
ফাঁকি	প্রবাসী	১৩৩১
ইরা	”	১৩৩৯
মালতী	উদয়ন	১৩৪১
লেখকের বিচার	প্রবাসী	১৩৪১

ঋতুপর্ণ : ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত [আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া হ'লো]

গল্প	পত্রিকা	সময়
ঋতুপর্ণ	প্রবর্তক	কার্তিক ১৩৪১
ভেরনল	বঙ্গশ্রী	কার্তিক ১৩৪১

রাণুর ঠাকুমা	আনন্দবাজার	আশ্বিন ১৩৪১
নিমাই	ভারতবর্ষ	বৈশাখ ১৩২৮
বিকাশের ডায়েরি		
আয়না	উদয়ন	কার্তিক ১৩৪১

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গল্প :

[কালানুক্রমিক : কয়েকখানি চিঠি, কিরণের কথা, খুনী, দুঃস্বপ্ন, কৈশোর প্রেম, বুড়োবুড়ি, শেষপূজা, ব্যর্থ মিলন, ভূমিকম্প, যূথিকা, পূর্ণিমা, প্রীতি ও মায়া, নার্স, অভিসার, আগুন, নমিতার দিন, সুচিত্রার কথা, সাইরেন, হলায়ুধের ডায়েরি, প্রতিহনন, সুজিতচন্দ্রের সমস্যা, সুবালার সাহস।]

১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ঝড়ের দোলা' নামের সংকলন গ্রন্থে 'শ্রীপতি' নামের ছোট গল্পটি স্থান পায়। প্রকাশক : ফোর আর্টস ক্লাব।

উপন্যাস

রমলা : ১৩২৯-৩০ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৩০ সালের আশ্বিনে গ্রন্থরূপে প্রকাশ।

জীবনায়ন : ১৩৪১-৪৩ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৪৩ সালের আশ্বিনে গ্রন্থরূপে প্রকাশ।

সহযাত্রিণী : ১৩৪৭ সালের অলকা পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৪৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

এষণা : ১৩৬৭ সালে ষষ্টি বার্ষিকী 'প্রবাসী স্মারকগ্রন্থে' প্রকাশিত। ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

পুস্তককারে অপ্রকাশিত উপন্যাস স্বপ্ন : ১৩৩০ সালের ভারতবর্ষে প্রকাশিত।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

অজয়কুমার : ১৩৩৭ সালের 'মৌচাকে' প্রকাশিত।

সোনার কাঠি (গল্পগ্রন্থ), গল্পসূচী : সন্দেশের দেশে, ঝাঁটা, বুরুশের ঝগড়া, বিশ্রী হাঁসের ছানা, মামার বাড়ি যাওয়া, দেবদারু গাছ, ঘুড়ির সুতো, ছোট দেশলাইওয়ালা, সিনডেরেলার কাণ্ড, নরেশের বাঙলা শিক্ষা, বুলবুলি ও গোলাপ। পরবর্তী সংস্করণে বুলুর স্বপ্ন, ডায়না, উচ্চৈঃশ্রবা ও লক্ষ্মণ ঝোরা গল্পগুলি যুক্ত হয়।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : রতনগড় (১৩৪০ সালের 'সন্দেশে' প্রকাশিত উপন্যাস)। প্রতিশোধ (পূজাবার্ষিকী 'যাদুঘর') সুইজারল্যাণ্ডে একদিন (পূজাবার্ষিকী 'চিত্রদীপ') ছোটগল্প।

অনুবাদ : মা ও মৃত্যু (Hans Anderson) : মৌচাক পৌষ ১৩৪০, 'হেন্‌জেল ও গ্রেট্‌লের কথা' : 'মাস পয়লা' ১৩৩৫, ইউরোপের চিঠি : মৌচাক আষাঢ়, ১৩৩২—আষাঢ়, ১৩৩৪, ও চিরসুন্দর কাশ্মীর : সন্দেশ ভাদ্র, ১৩৪১, ভ্রমণকাহিনী।

ছোটদের পরিচিতিমূলক রচনা : ('মৌচাকে' ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত) তক্ষশীলা, ইলোরা খাজুরাহ, এভারেষ্ট আরোহণ।

পাঠ্য পুস্তক

সহজ সাহিত্য পাঠ (পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে—প্রকাশকাল ১৩৪১), নব সাহিত্য পাঠ (ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে—প্রকাশকাল ১৩৪১), সহজ বাল্যপাঠ (প্রথম থেকে চতুর্থ ভাগ, প্রকাশকাল ১৩৪২-৪৩)। প্রকাশক—ম্যাকমিলান কোম্পানী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অন্যান্য রচনার তালিকা

ইউরোপের চিত্রশালা (লুভারের চিত্রশালা, লুভারের মিউজিয়াম, কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মের চিত্রশালা, ড্রেসডেন, ফ্লেমিশ চিত্র, থারিস্)।

ইউরোপ ভ্রমণ (হল্যাণ্ড, জুরিক হ'তে মনত্রো, শীতের সুইজারল্যাণ্ড, লের্জাঁ, ভইমার, রোথেন বুর্গ, নুরনবেয়াগ, ডিঙ্কেল্‌স বুল, বুডাপেষ্ট, রোম। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৩৩—১৩৩৬ সালে প্রকাশিত)।

অন্যান্য রচনা : ফরাসি ইম্প্রেসনিষ্ট চিত্রকরদের কথা, জলপথে, রোমাঞ্চ তৃষ্ণা, রবীন্দ্রনাথ।

সম্পাদক : পরিকল্পনা (অর্থনীতি বিষয়ক, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সংগ্রহ। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের সংকলন অভিনব)। প্রকাশকাল ১৩৫১। (লেখক সূচী : অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবোধ বসু, ভূপতি চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শচীন সেন, কালীচরণ ঘোষ, সুধীরকুমার চৌধুরী ও মণীন্দ্রলাল বসু)।

মীনকেতুর কৌতুক : উপন্যাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীর সহযোগে। প্রকাশকাল, বৈশাখ ১৩৪৮।

আনুষঙ্গিক তথ্য ও নির্দেশিকা :

১. মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' (১৯২৩)-র সমসময়ে বা কাছাকাছি সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ ১৯১৬, ঘরে-বাইরে ১৯১৬, গল্পগুচ্ছ (৩য় খণ্ড) ১৯২৬।

প্রমথ চৌধুরী : চার-ইয়ারি-কথা ১৯১৬, আহুতি ১৯১৯।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গহনার বাক্স ১৯২১, হতাশ প্রেমিক ১৯২৩।

অনুরূপা দেবী : মা ১৯২০।

নিরুপমা দেবী : পরের ছেলে ১৯২৪।

শান্তা দেবী : চিরন্তনী ১৯২১।

সীতা দেবী : পথিক বন্ধু ১৯২০, রজনীগন্ধা ১৯২১।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় : মনে মনে ১৯১৯, পাপড়ি ১৯২১।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : যমুনা পুলিনের ভিখারিণী ১৯২৩।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : মৃণাল ১৯২২, বাবলা ১৯২৪।

হেমেন্দ্রকুমার রায় : রসকলি ১৯২২, মালা-চন্দন ১৯২২, ঝড়ের যাত্রী ১৯২৩।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী : অচলপথের যাত্রী ১৯২৩, চাষার মেয়ে ১৯২৪।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : গৃহদাহ ১৯২০, দেনাপাওনা ১৯২৩, পথের দাবী ১৯২৬।

নজরুল ইসলাম : ব্যথার দান ১৯২২, রিক্তের বেদন ১৯২৫।

গোকুলচন্দ্র নাগ : রূপরেখা ১৯২২, পথিক ১৯২৫, মায়ামুকুল ১৯২৭।

দীনেশরঞ্জন দাশ : মাটির নেশা ১৯১৮, ভুঁইচাঁপা ১৯২৫, দীপক ১৯২৭।

২. প্রসঙ্গত, মনে পড়ে 'চার-ইয়ারি কথা'র 'সেনের কথা'য় যেখানে চিরন্তনী নারী ও রোমান্টিক প্রেমবাসনার কথা বলা হয়েছে—"আমার দেহমন মিলেমিশে এক হয়ে একটি মূর্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল, এবং সে হচ্ছে ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাবার বাসনা। আমার মন্ত্রমুগ্ধ মনে জ্ঞান বুদ্ধি, এমন কি চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল।"

৩. "কাজী সাহেবের মুখে পার্শি হাফেজ-টাফেজগুলো, এগুলো চারুবাবু লাগিয়েছিলেন।"

৪. "Years went over, and the giant grew very old and feeble. He could not play about any more, So he sat in a huge arm-

chair, and watched the children at their games, and admired his garden. 'I have many beautiful flowers', he said, 'but the children are the most beautiful flowers of all!'

—The Selfish Giant by Oscar Wilde

৫. "—তো 'জীবনায়ন'টাও তাই। 'জীবনায়ন'টাও—তখন পার্কসার্কাসে রয়েছি। ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস করছি তখন। কালিদাস নাগও আসতেন, রামানন্দবাবু আসতেন। রামানন্দবাবু একদিন সকালে এসে হাজির। 'মণীন্দ্র শোনো, তোমায় একটা উপন্যাস লিখে দিতে হবে।' বললাম, 'আমি এখন কী করে লিখবো; আমার সময়ই তো নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাইকোর্ট—।' 'লেখো না, লিখতে আরম্ভ করো'। আমি—আপনাদের আবার পয়লার মধ্যে তো দিতেই হবে। পয়লা বেরোবে। তখন ট্র্যাডিশন ছিলো 'প্রবাসী'র যে, পয়লা কাগজ বেরোবে। তার আগে আপনাকে দিতে হবে। আমি কখন কী দেবো! 'সে হবে না, শান্তা আছে, তাগাদা দিয়ে তোমার কাছে নিয়ে নেবে।' তাইতেই এই 'জীবনায়ন'টা লেখা হয়।"

৬. 'সবুজপত্র' আমি সাবস্ক্রাইব করতাম—তখনকার দিনে 'সবুজপত্র' আর কজন রাখবে! 'সবুজপত্র' নিয়ে ওর (ফণিভূষণ চক্রবর্তী) বাড়িতে, ঘরে ব'সে আলোচনা-পড়া হ'তো।"

৭. "আমরা ইংরেজি সাহিত্য যেভাবে সে সময়ে পড়েছি, এরকম প্রফেসর আর কখনো হয়নি, ইভ্‌ন্ (even) প্রেসিডেন্সী কলেজেও হয়নি। একদিকে মনোমোহন ঘোষ, একদিকে প্রফুল্ল ঘোষ, তারপরে হোমস্, স্টার্লিং, তারপরে আরও পড়েছি আমরা…"

৮. 'সুকান্ত' গল্পের নায়কের নামানুসারে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র নামকরণ করা হয়—এ তথ্য প্রথম জানতে পারি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য-র কাছ থেকে। পরে, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইতিবাচক উত্তর দান। গল্পের সুকান্ত আর কবি সুকান্তের মৃত্যু অভিঘাতায় আশ্চর্য মিল।

৯. "একটা গল্পে মনে হয় 'শেষের রাত্রি'র সঙ্গে খানিকটা সিমিলারিটি আছে।"

১০. "উনি (রবীন্দ্রনাথ) যখন বিলেতে প্রথম গেছলেন, তখন তো ইংরেজি সাহিত্যের লেখা…টমাস মূর আর ওইসব পড়েছেন। সেইটার—ওঁর ওই

বাল্মীকি-প্রতিভার ওপর ইংরেজি সাহিত্যের ফর্মটার আর গানের খুব ইনফ্লুয়েন্স (influence) আছে।"

১১. "সাহিত্য জগতে 'রমলা'র লেখকরূপে পরিচিত মণীন্দ্রলাল বসু আমাদের সভায় যোগ দিতেন, কিন্তু এত চুপ করে থাকতেন যে তাঁর গলার স্বর যেন শুনিনি।"—সুনীতি দেবী।

১২. মণীন্দ্রবাবুর "মবিড" গল্প অনেকেই অনুসরণ করিয়াছেন। গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুই বোধকরি মণীন্দ্রবাবুর এই ধরণের গল্পকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিল।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ড. সুকুমার সেন, পৃ: ৩৩৩।

১৩. "তারপর হ'লো কি, এই যে এরা অচিন্ত্য, তারপরে—বুদ্ধদেব তো অনেক পরে গোকুল আর দীনেশ—এরা বিশেষ বন্ধু আমার। ওদের ইয়ে ছিলো কি জানো, এই যে তখনকার নিজেদের জীবনেও, সেক্স-এর যে ইয়েটা, সেক্স আর এই অন্য থীমগুলো, সেইগুলো নিয়ে এই যে লেখা, সেগুলো 'প্রবাসী' নিচ্ছে না। সুতরাং আমরা নিই। 'কল্লোল'-এ যে লেখাগুলো বেরিয়েছে, সাহিত্য হিসেবে খুব যে—কাঁচা লেখা। কাঁচা মনের কাঁচা লেখা।"

১৪. "আমাদের বাঙালির পরিবারের মেয়েরা পড়বে, ছেলেরা পড়বে, সেজন্যে সেখানে (প্রবাসীতে) একটা স্ট্যাণ্ডার্ড, মর‍্যাল-স্ট্যাণ্ডার্ড খুব স্ট্রিকট (strict) ছিলো।"

১৫. মণীন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মরাগে'র সুখ্যাতি করলেন, Wagner-কৃত জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন।—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' বইটি থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ৪৪।

" চিহ্নযুক্ত, নির্দেশিকা শিরোনামের অন্তর্গত, সমস্ত উক্তিগুলি শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর। গত ২৪।২।৮৫ তারিখে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ে তাঁর এই সংলাপাংশ প্রায় জোর ক'রে টেপ-রেকর্ডারে ধরে নিই! সঙ্গে ছিলেন শ্রী দুর্গা দত্ত। তিনিই এ-ব্যাপারে মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রবন্ধে উদ্ধৃত আত্মজৈবনিক উক্তিগুলি মণীন্দ্রলাল বসুর দেওয়া অভিভাষণের (৩১।১০।৮০—কোলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সম্বর্ধনাসভায়)।

এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ অধ্যাপক বিমল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

বিপ্লব আন্দোলনের শেষ অধ্যায় ঃ একটি আলোচনা

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

[১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নেতা বিপ্লবী সূর্য সেন ফাঁসির দড়িতে জীবন বিসর্জন দেন। তাঁর আত্মদানের পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে স্মরণ করে এই রচনাটি বিভাব-এর জন্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু এটি অনেক দেরী করে আসায় সময় মতো ছাপান যায়নি। বর্তমান সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশ করা হল—সম্পাদক।]

Bengal Terrorism & The Marxist Left নামক সুপরিচিত গ্রন্থের লেখক David M. Laushey বাংলা দেশের বিপ্লব (সন্ত্রাসবাদ) আন্দোলনকে চারটি বিভিন্ন সময় সীমার পর্বে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই শেষ পর্বের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই পর্বের শুরু ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের পর এবং শেষ ১৯৩৪ সালে। মোটামুটি এই পাঁচ বছর সময়ে বাংলা দেশের বিপ্লবীদের দ্বারা নানা রকম দুঃসাহসিক কর্ম সাধিত হয়েছিল। এই সময়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাটি হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ এপ্রিল ১৯৩০)। এই ঘটনার জের হিসেবে দেশের সর্বত্র পুলিশী তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মাস্টারদা ধরা পড়েন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩) এবং এক বছর বাদে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দেন (১২ জানুয়ারী ১৯৩৪)। তাঁর মৃত্যুর পর বিপ্লবী সংগঠনগুলি ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তবু এরই মধ্যে কয়েকজন বিপ্লবী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পীড়নকারী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় মেতে ওঠেন। ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে

চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার মাঠে সমবেত ইউরোপীয় দর্শকমণ্ডলীর ভিড়ে বিপ্লবীরা বোমা ফেলেন। এই ঘটনার ঠিক পাঁচ মাস বাদে দার্জিলিঙের লেবং রেস কোর্সে অন্য দুইজন বিপ্লবী বাংলার গভর্নর এ্যাণ্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। এর পর ১৯৩৫ সালেও দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। কিন্তু এগুলি আন্দোলনের বিবর্ণ স্ফুলিঙ্গ মাত্র। ঘটনার সেই ঘনঘটা আগেকার মতো আর লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য ১৯৪২ সালে এই ক্ষয়িষ্ণু আন্দোলন আরো একবার দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেই আন্দোলনের চেহারা ও চরিত্র তখন অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। তাই এই সময়কার ঘটনা বাদ দিয়ে মোটামুটি এইটুকু বলা চলে যে ১৯৩৪ সালের পর থেকেই বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের চতুর্থ পর্বে ক্রমশ ভাঁটা পড়তে থাকে।

কিন্তু কেন এই বিপর্যয়? বিপ্লব আন্দোলন কেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল Laushey তার কারণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দমনমূলক ব্যবস্থা সমূহের উল্লেখ করেছেন। বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ইংরাজ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মনে এমন একটা ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে তাঁরা এইসব দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি সত্বর গ্রহণ করবার জন্য একযোগে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এঁদের চাপের কাছে সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হন এবং এর ফলে আগেকার সব রকমের ব্যবস্থার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ যে এ দেশে বসবাসকারী ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের মনে দারুণ একটা প্রাণভয়ের বোধ সঞ্চার করেছিল এবং তাঁরাই যে সরকারকে চাপ দিয়ে এই সকল নিপীড়নমূলক আইন পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন সে-কথা স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে Laushey-র কিছুটা দ্বিধার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উল্লিখিত বইয়ের এক জায়গায় তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, "there can be no doubt that the British in Bengal were frightened and that the morale of the services were breaking down." কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পিছনে যে কিছুটা দ্বিধা এবং সংশয় রয়ে গিয়েছে সে-কথা ধরা পড়ে যখন ঠিক এই প্রসঙ্গেই অন্য এক জায়গায় তিনি উপরোক্ত উক্তির বিপরীত আর একটি মন্তব্য করে লেখেন যে, "Bengali writers invariably tend to exaggerate the fear and cowardice of British officials in India."[১]

প্রাণভয়ের তাড়নায় দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি সত্বর অবলম্বন করার ব্যাপারে বাংলা দেশের প্রশাসনিক মহল যে কি পরিমাণ তৎপরতা দেখিয়েছিলেন তা বুঝতে হলে সমসাময়িক কালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিল অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। Laushey বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বইতে অন্য আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় সরকারী দলিল ও চিঠিপত্রের উল্লেখ নেই। তাই স্বভাবতই মনে হয় যে তিনি হয় এইগুলি দেখার সুযোগ পান নি, না হয় এগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন নি।[২] Laushey-র বইতে অনুল্লিখিত এই সকল উপাদানের মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নোটের কথা উল্লেখ করতে হয়। এর প্রথমটি লিখেছিলেন বাংলা দেশের তৎকালীন চিফ সেক্রেটারী W. S. Hopkyns. ১৯৩২ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে লেখা এই গোপন নোটে তিনি সন্ত্রাসবাদ দমনে বাংলা দেশের সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইছেন এবং আরো কী সব নতুন আইন প্রবর্তন করতে আগ্রহী সে বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। নোটটি Measures to deal with Terrorism এই শিরোনামে লিখিত হয়েছিল এবং এটি অনারেবল মেম্বার W. D. R. Prentice-এর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। উপরোক্ত নোটটির জবাবে প্রেস্টিস ১৮ই জানুয়ারী তারিখে অন্য আর একটি নোট হপকিন্স-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই নোটে তিনি হপকিন্স-এর অভিমতগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য সেই বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এই দুটি নোট পর্যালোচনা করলে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য সরকার সঠিক কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং কোন্ বাস্তব পরিস্থিতিতে এগুলি কার্যকর হয়েছিল সে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুটি নোট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

প্রথমেই হপকিন্স-এর নোটের সাত ও আট নম্বর অনুচ্ছেদ দুটির উপর মনোযোগ দেওয়া দরকার। সাত নম্বর অনুচ্ছেদে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকর্মের ব্যাপকতা কিভাবে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের মনে অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সে-কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে পুলিশ ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আসানুল্লার হত্যার (৩০এ আগস্ট ১৯৩১) ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়। অস্ত্রাগার আক্রমণের পর উপদ্রুত এলাকায় পুলিশী অনুসন্ধানের কাজে আসানুল্লা নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই কারণেই উগ্রপন্থীদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। হপকিন্স-এর মতে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছিল যে

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের দমন করার কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সরকারের তরফে এই ব্যর্থতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য সরকারী কর্মচারিগণ যথেষ্ট পরিমাণে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, "…gang of terrorists, who has succeeded in preventing all attempts to capture or suppress them and in keeping the officials and others at Chittagong in a constant state of apprehension." এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ফলে সরকারী কর্মচারিগণ সরকারের সামর্থ ও শক্তির উপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন এবং তাঁরা এটাও বুঝতে পারছিলেন যে রাজ্যের চালু আইনগুলির সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের দমন করা সম্ভব নয়। সরকার এবং দেশের আইনগুলি সম্পর্কে অনাস্থার ভাব শুধু যে চট্টগ্রাম এলাকার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। রাজ্যে অন্যান্য স্থানেও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারীদের মনে এই অনাস্থার ভাব সংক্রামিত হয় এবং এর ফলে দেশের শৃঙ্খলা ও স্থিতাবস্থাও ব্যাহত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হপকিন্স লেখেন "this lack of confidence in the presence of a danger such as terrorism is apt to produce a belief that violence and reprisals are more effective than the hampered processes of law." অর্থাৎ বিপ্লবীদের সৃষ্ট সন্ত্রাসকে ঠেকাবার জন্য পুলিশের তরফেও বিকল্প শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করার একটি প্রবণতা জন্মলাভ করেছে এবং এর ফলে দেশের আইন শৃঙ্খলা সামগ্রিক ভাবে বিপন্ন হবার যোগাড় হয়েছে।

হপকিন্স এই অনুচ্ছেদে সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে পুলিশ আমলাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে এই শ্রেণীর রাজ কর্মচারিগণ তাঁদের মানসিক ভারসাম্য ক্রমশ হারাতে চলেছেন এবং হপকিন্স আকারে ইঙ্গিতে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পুলিশের মনোবল ফেরানোর জন্য সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যদি অবিলম্বে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে তাঁরাও সরকারী শৃঙ্খলা বিধি অমান্য করে পালটা অত্যাচারের নেশায় মেতে উঠতে পারে। হপকিন্স এর উপরোক্ত নোটের উল্লিখিত শেষ কয়টি লাইনের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকির সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বক্তব্যের নির্গলিতার্থ এই যে সন্ত্রাসবাদীদের কাজে সরকারের পদস্থ অফিসিয়ালগণ যার-পর-নাই ভীত হয়ে উঠেছেন এবং এই ভীতির উপশম করার জন্য সরকারের অবিলম্বে কিছু বলদায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

আট নম্বর অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সন্ত্রাসবাদ ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা এমনিতেই খুব কম। এর উপর বিপ্লবীদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিগত দু বছরের মধ্যে বেশ কয়েকজন সিভিলিয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। এ সবের জন্য এ দেশে কর্মরত ব্রিটিশ আই. সি. এস-দের সংখ্যা এমনভাবে কমে এসেছে যে অল্প যে কয়েকজন তখনও চাকরিতে নিযুক্ত কেবল তাঁদের নিয়েই গোটা রাজ্যের প্রশাসন কাঠামো টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে। আই. সি. এস. ক্যাডারের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা যায় সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিপূর্বে বেশ কিছু প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশ করা হয়েছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদটিতে হপকিন্স উল্লিখিত সমস্যাটি সম্পর্কে আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে এই রাজ্যে যে কয়জন আই. সি. এস নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই তিন জন অবসর নিয়েছেন এবং অপর তিনজন বিপ্লবীদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। ফলে গোটা রাজ্যে বর্তমানে মাত্র ১৪জন ব্রিটিশ জেলা অফিসার ও ৬জন ব্রিটিশ জেলা জজ কর্মে নিযুক্ত আছেন। এই সামান্য সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারদের নিরাপত্তা রক্ষা, রাজ্য সরকারের কাছে একটা রীতিমত বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে জেলায় নিযুক্ত ব্রিটিশ অফিসারদের নিজেদের কাজের প্রয়োজনেই জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। অথচ অবস্থা বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে তার ফলে এঁদের পক্ষে কোন মতেই জনসংযোগ রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুত এই শ্রেণীর অফিসারদের জন সমক্ষে যাতায়াতের ব্যাপারে বেশ কিছুটা অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। এর ফলে পরিস্থিতি কি-রকম ঘোরাল হয়ে উঠছে, হপকিন্স তা সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি লিখছেন :

> Precautions must be taken and risks must be avoided. This necessarily means that officers are less accessible than they used to be; they have to take precautions about the visitors they see, and about the places they visit; they have to avoid meetings and gatherings of all kinds at which they cannot be protected; they are less free in every way to carry out their duties.

হপকিন্স আরো লিখেছেন যে এই রকম অন্তরীণ অবস্থায় দিন যাপন করতে

বাধ্য হওয়ায় অফিসাররা ক্রমশই হাঁফিয়ে উঠছেন। অবশ্য এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির চাপে সব অফিসারদের মনে যে একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে তা নয়। কারও কারও মানসিক গঠন বেশ মজবুত এবং তাঁরা পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু এঁরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। হপকিন্স সমস্যাটি সম্পর্কে বেশ কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার সময় তাঁর মনে হয়েছে যে "the feeling is growing, especially among senior officers and those with families, that it is not worth while staying on in Bengal under present conditions."

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব H.W.Emerson-ও মাত্র তিন সপ্তাহ আগে হপকিন্স-এর কাছে লেখা একটা গোপন চিঠিতে ঠিক অনুরূপ মন্তব্য করেন। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখের লেখা এই চিঠিখানি বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিভাগের ২৯১/১৯৩১ নম্বর ফাইলে রক্ষিত আছে।[৩] এই চিঠিতে ইমার্সন লিখেছেন যে যদিও পুলিশ সহ সরকারের অন্যান্য বিভাগের আমলারা সন্ত্রাসবাদী দাপটের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুঝে চলেছেন, তবুও এ কথা মানতেই হবে যে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির চাপে তাঁদের মনোবল ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। ইমার্সন লিখেছেন যে সম্প্রতি একটি মামলার বিচার কালে জনৈক বিচারপতি এই মতো মন্তব্য করেন যে পেডি হত্যার মামলায় তাঁকে যদি বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হত তাহলে তিনিও ছুটি নিতে বাধ্য হতেন—সে ছুটি তাঁর পাওনা থাক আর না-ই থাক। ইমার্সনের মতে বিচারকের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে বাংলা দেশের ব্রিটিশ অফিসারগণ কি পরিমাণে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন।

বাংলা দেশে একমাত্র সন্ত্রাসবাদী অভিযানের ফলেই যে ব্রিটিশ অফিসারদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল তা নয়। ভারতবর্ষের আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে তাঁরা যে সে দেশে অদূর ভবিষ্যতে কোণঠাসা হয়ে পড়বেন এই ভয়েও তাঁরা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ছিলেন এবং সে কথা তাঁরা হপকিন্স-এর কাছে নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেন। মোট কথা হপকিন্স নানা সূত্রে বিভিন্ন অফিসারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে পরিস্থিতি বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে সেইভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে এই সকল আই. সি. এস অফিসাররা হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে না হয় গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসবেন এবং সে রকম পরিস্থিতিতে এ দেশের প্রশাসন

ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

গোয়েন্দা দপ্তরের এই সময়কার একটি নোটে বাংলা দেশের ব্রিটিশ অফিসারগণ একটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছেন ("living in a state of war") বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। Laushey মন্তব্যটির মধ্যে অতিশয়োক্তির আভাস খুঁজে পেয়েছেন।[৪] কিন্তু হপকিন্স-এর বর্ণনায় গোয়েন্দা দপ্তরের মন্তব্যটিই সমর্থিত হয়েছে। তাঁর উল্লিখিত নোটের সাত এবং আট নম্বর অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে বাংলা দেশে নিযুক্ত আই. সি. এস. এবং অন্যান্য সার্ভিসের পদস্থ ব্রিটিশ আমলারা নিজ নিজ প্রাণের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের গতিবিধি যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছিলেন। বাংলা দেশের সব চেয়ে উপদ্রুত এলাকা চট্টগ্রামে এই সব অফিসারদের জীবন সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার অজুহাতে অস্ত্রাগার আক্রমণের অব্যবহিত পরেই সেনাবাহিনী নামানো হয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী নিয়োগ করার পরেও রাজ্যের অনেক জায়গাতেই অবস্থার কোন দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। চট্টগ্রামের ডিভিসনাল কমিশনার E. N. Blandy রাজ্যের চিফ সেক্রেটারীর কাছে লেখা একটি গোপন প্রতিবেদনে (ডি. ও. নং ৫২০ সি. তাং ৩০, ৫, ১৯৩৪, দ্রষ্টব্য গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, হোম পোলিটিক্যাল ২৭৭/১৯৩৪) নিজেই একথা স্বীকার করে গিয়েছেন। ব্ল্যাণ্ডির এই নোটের নবম অধ্যায়ে স্বীকার করা হয়েছে যে ১৯৩১-৩২ এর শেষ অবধি চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরা বজায় রেখেও বিপ্লবী সংগঠনগুলির বিন্দু মাত্র ক্ষতি সাধন করা যায়নি। সূর্য সেন আগের মতোই আত্মগোপন করে রয়েছেন। পাহাড়তলি এলাকায় পুরোনো সন্ত্রাসবাদী কায়দায় আগের মতোই ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপর আক্রমণ চালান হয়েছে এবং সব চেয়ে আশঙ্কার কথা ধলঘাটে বিপ্লবীদের সঙ্গে এক সম্মুখ যুদ্ধে ক্যামেরুণ নামে জনৈক ব্রিটিশ সামরিক অফিসার নিহত হয়েছেন। অর্থাৎ সেনাবাহিনী মোতায়েন করেও বিপ্লবীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়নি। বরং ব্যাপারটা ঠিক উল্টোই হয়েছে। সেনাবাহিনীর নিয়োগ পদ্ধতির ব্যর্থতা রাজভক্ত নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারীদের মনে হতাশা এবং ত্রাসের মনোভাব আরো বাড়িয়ে তুলেছে—"The very fact of this activity producing no results···had in my opinion a discouraging effect on···the public who were loyal, while it had a correspondingly encouraging effect···on the

terrorists." ব্লাণ্ড শুধু রাজভক্ত নাগরিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথাই উল্লেখ করেন নি। তাঁর মতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও ঠিক ঐ একই রকম মনোভাব ক্রিয়া করে এসেছিল।

বস্তুত Laushey স্বীকার না করলেও এ কথা ঠিক যে বাংলা দেশের ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিগণ তখন যথার্থই একটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে বাংলা দেশের সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সভার পূর্ণ বিবরণীগুলি পাঠ করলে এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির যথার্থ চেহারাটি অনুধাবন করা যায়।

প্রসঙ্গত একটি তথ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন বিষয়ে যে সব অজস্র বই ও নানা ধরনের সরকারী দলিল ও নথিপত্র রয়েছে সেগুলি পড়ার পর অনেক সময় এই ধারণা হয় যে বিপ্লব আন্দোলনের উগ্রতা এবং আতিশয্য কোন কোন জায়গায় স্থানীয় নাগরিকদেরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সন্ত্রস্ত সরকারী রাজপুরুষদের মতো এই সকল শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ নাগরিকগণও এই আন্দোলনের দ্রুত পরিসমাপ্তি কামনা করেছিলেন। বিপ্লববাদকে দমন করার সরকারী উদ্যোগে এঁরা অনেক সময় কর্তৃপক্ষকে সাহায্যও করেছিলেন। মোট কথা সন্ত্রাসবাদীদের দমন করবার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ যেমন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এসেছিলেন তেমনি এইসব শৃঙ্খলাপরায়ণ নাগরিকেরাও সরকারকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরোক্ষে উৎসাহিত করে এসেছিলেন। কিন্তু হপকিন্স-এর পূর্বোক্ত নোটটি পাঠ করলে এ বিষয়ে কিছুটা বিপরীত ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলা দেশের সাধারণ নাগরিকদের মনে বিপ্লববাদ আন্দোলন কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে হপকিন্স-এর নোটের পঞ্চম অনুচ্ছেদে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বিপ্লব আন্দোলনের দাপটে দেশের মুষ্টিমেয় সঙ্গতিসম্পন্ন অধিবাসী কিছুটা বিচলিত বোধ করছেন। এঁদের দলে মুসলমান নাগরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা চলে কেন না ইংরাজ সরকারের প্রতি তাঁদের কোন রকম সহানুভূতি না থাকলেও বিপ্লবী তরুণ সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড তাঁরা মনে মনে বেশ অপছন্দই করতেন—"There is some apprehension among more well-to-do people who feel that life and property are not safe. Muhammadans generally, though they have little sympathy left for Government, disapprove of terrorism

and resent the pretensions of youthful volunteers and revolutionaries." এঁরা ছাড়া রাজ্যের বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার নামে যে রকম নির্বিচার ধর পাকড়ের রাজত্ব শুরু করা হয়েছিল তাতে সরকারের বিরুদ্ধেই ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিপ্লবীদের প্রতিই সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মোট কথা বিপ্লবীদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন দেশের সাধারণ মানুষের মনে কি রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে কোন সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় না ("It is difficult to generalise about the effect on the public.")। সব মিলিয়ে বরং এ কথাই বলা চলে যে দেশের সাধারণ মানুষ সরকার এবং বিপ্লবীদের মধ্যে যে লড়াই চলেছিল সে সম্পর্কে কিছুটা নিস্পৃহ মনোভাব অবলম্বন করে রইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা মনে মনে বিপ্লবীদের প্রতিই সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল—"The general feeling is probably one of aloofness ; a struggle is going on between Government and revolutionaries, and sympathy is mostly with the latter." সুতরাং বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ত্রিশের দশকে যে সব মাত্রাতিরিক্ত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার জন্য এ রাজ্যের ব্রিটিশ অফিসাররাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দায়ী। এ ব্যাপারে ভারতীয় নাগরিকদেরও হয়ত কিছু ভূমিকা ছিল, কিন্তু তা নিতান্তই নগণ্য মাত্র।

হপকিন্স-এর উল্লিখিত নোটে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করবার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে একটি বিস্তারিত তালিকা পেশ করা হয়েছিল। এই তালিকায় দেশী সংবাদপত্রগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নতুন একটি আইন রচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাছাড়া Bengal Criminal Law Amendment Act-টিকেও এমনভাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যাতে বিনা বিচারের বন্দীদেরও কারাবাসের সময় বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের মতো শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করা যায়। এছাড়া Bengal Emergency Power Ordinance-এর মতো অন্য একটি আইন জারি করে সরকারের হাতে আপৎকালীন অবস্থায় বিশেষ আদালত গঠন করার ক্ষমতাও অর্পণ করার জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। এই তিনটি মূল প্রস্তাব ছাড়া হপকিন্স এমন আরো কয়েকটি দাবী পেশ করেছিলেন যেগুলি আদায় করা হলে রাজ্য সরকারের পক্ষে স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেই সঙ্গে

কলকাতা কর্পোরেশন সহ রাজ্যের অন্য সকল স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলির উপর প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হবেন।

হপকিন্স-এর নোট পাওয়ার পর অনারেবল মেম্বার W. D. R. Prentice-ও আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে একটি নাতিদীর্ঘ নোট প্রস্তুত করেন (তাং ১৮-১-১৯৩২)। এই নোটটি পড়লে জানা যায় যে প্রেন্টিস, হপকিন্স প্রস্তাবিত সব কটি দমনমূলক আইন ঠিক সেই মুহূর্তে জারি করার পক্ষপাতি ছিলেন না। বিশেষ করে, Bengal Criminal Law Amendment Act ও Special Court চালু করার ব্যাপারে তাঁর বড় রকমের আপত্তি ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রস্তাবিত আইন সমূহের উপযুক্ততা সম্পর্কে এইভাবে যখন আলাপ আলোচনা চলছিল ঠিক তার কয়েকদিন আগেই বেশ কয়েকটি আইন পাশ করা হয়ে যায়। হপকিন্স তাঁর নোটটি পাঠানোর প্রায় শেষ মুহূর্তে জানতে পারলেন যে তিনি যা চাইছিলেন মোটামুটি সেই রকমেরই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডিন্যান্স ইতিমধ্যেই জারি করা হয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে এই আইন ও অর্ডিন্যান্সগুলি যখন বলবৎ করা হয় সেই সময় আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকটি যাতে একটি প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সমাধা হয় সেই জন্য সরকারের তরফে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে বলে ভারতবাসীর মনে আশা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সরকার এই প্রত্যাশা ভঙ্গ করলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (৭ সেপ্টেম্বার ১৯৩১) চলা কালেই ইংরাজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আচমকা বেশ কতকগুলি দমনমূলক আইন পাশ করলেন। প্রথমেই ৯ই অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে Indian Press (Emergency Powers) Act-টি জারি করা হল। তারপর ঐ মাসেরই ২৯ তারিখে Ordinance IXটি পাশ করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের বলে সরকার বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোন প্রত্যক্ষ কর্মী তো বটেই, এমন কি যে-কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে বন্দী করে রাখার ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। সবশেষে ঐ বছরের ৩০ নভেম্বার তারিখে Bengal Emergency Powers Ordinance-টিও জারি করা হল। এই আইনের অধিকারে সরকার সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একযোগে উপদ্রুত এলাকার সর্বত্র সরকারী আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। "This ordinance was aimed at crushing terrorism and restoring the prestige of Government and the morale of its servants in those parts of Bengal where the danger was greatest."[৫] এই Ordinance, হপকিন্স-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারকে বিশেষ আদালত (Special tribunal) গঠন করার ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছিল।

পরিশেষে আগে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি আরও একবার বলা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে আমরা সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের শেষ পর্বটি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। এই পর্বে বিপ্লব আন্দোলন এতই মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে এর দাপটে এ দেশের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের আস্থাভাজন ব্যক্তিরা রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রাণ রক্ষার তাগিদেই সরকার নিত্য নতুন দমনমূলক আইনের সাহায্য নিয়ে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংহার মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ বিপ্লবীরা সরকারের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসী আন্দোলনের ধারাটি যদি বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত তাহলে এ দেশের ভবিষ্যৎ হয়ত ভিন্নভাবে রচিত হত।

নির্দেশিকা

১। Laushey M. David, Bengal Terrorism & The Marxist Left, Calcutta, 1975, p. 79

২। এইগুলি হল : ক) Provincial anti-terrorist conference, 16, Sept. 1934

খ) Govt. of Bengal, Political deptt, Political 277 / 1934

৩। Laushey M. David, প্রাগুক্ত p. 79

৪। ঐ

৫। Govt. of Bengal, Home (Pol) 4-41 / 1932 দ্রষ্টব্য Laushey ঐ, p. 78

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি-শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমের আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

১। উন্নতমানের বীজ। ২। রাসায়নিক সার ৩। জৈব সার। ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ ৫। মাটি সংশোধক ৬। বিভিন্ন ধরনের শাক্‌সব্‌জির বীজ, তৈল বীজ ও দানাশষ্য।

১। ভেটের/ইণ্টারন্যাশানাল/ট্র্যাক্টর ২। কুবোটা/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার ৩। "সুজলা" ডিজেলে চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্প সেট ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত "বেনাগ্রো" স্প্রেয়ার ৫। বেনাগ্রো পাওয়ার/পেডাল স্প্রেশার ৬। হস্তচালিত হুইলহো/সীড উইডার/সীড ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি। ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে চালিত সরলা পাম্প।

তদুপরি—

ক। কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটা সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে—যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্টমানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

খ। কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন—

ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল) কলিকাতা ৭০০০০১

টেলিফোন ঃ এগ্রিপুট

টেলিফোন ঃ ২২-২৩১৪
২৩-৩১৯২

হ্যোল্ডারলীনের জীবন ও রচনার রূপকালেখ্য

নিয়তি ও দেবযান

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পূর্বভাষ

হ্যোণ্ডারলীনের জীবন ও রচনা নিয়ে রচিত এই কোলাজ কবিজীবনের দিব্য ট্র্যাজিডির নাট্যরূপ। এই কবি (১৭৭০-১৮৪৩) অস্তিত্বের মাধ্যমে মানুষের জীবনের চূড়ান্ত বোধ অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কবিতা ও কাব্যধর্মী গদ্যও সেই জায়মান গরজে দিনে-দিনে হয়ে উঠেছিল বোধিবিদ্ধ। এই অর্জনের দাবি ছিল এতই তীব্র যে তিনি ঈশ্বর বা প্রেমিকার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত রফা করতে পারেন নি। প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের জায়গায় তিনি সেই সব দেবতাদের অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যাঁরা মানব নিয়তিকে হয়তো স্বনির্ভর করে তুলতে পারেন। হ্যোণ্ডারলীন তাঁর প্রেমিকা সুশেৎ-এর মধ্যে পূর্ণতার প্রতিমা দিওতিমাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তবু সেই জ্যোতির্বলয়িত প্রেমও তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর নান্দনিক বহু দেববাদে প্রেম ও পুজার নশ্বর-নির্মিত দুই শৈষাদ্রিচূড়ার অতৃপ্তিসুন্দর উদ্ভাসন আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

জীবন ও কবিতার সমীকরণ এত অব্যবহিত বলেই তাঁর জীবনালেখ্য রচনা দুরূহতম কাজ। পেটার হ্যোর্টলিং কবির ভাবার্পিত সত্তার উপর জোর দিয়ে কবির কৈশোর ও প্রেমের নিসর্গ মায়াবী রঙে এঁকেছেন। পক্ষান্তরে, পেটার হ্বাইস তাঁকে ঘিরে যুগনিষ্ঠ জীবননাট্য রচনা করেছেন। কবি যখন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দুর্গে কার্ল মার্কস দর্শনার্থী হয়ে এসেছিলেন, বিপ্লবের বীজাংকুর বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। হ্বাইসের প্রতিবেদনে তারি স্মৃতিবৃত্ত পাওয়া যায়। আমরা হ্যোর্টলিং ও হ্বাইসের এই দুটি মেরুপ্রতিম দৃষ্টিকোণ মেলাতে চেয়েছি।

হ্যোণ্ডারলীনকে এইমাত্র উন্মাদ বললাম। কিন্তু সত্যি কি তিনি ঐ অভিধায় বর্গীকৃত হতে পারেন? সম্প্রতি ইয়োরোপের ভাবুক মহল ও বিপ্লবী শিবিরে এ নিয়ে দারুণ দ্বৈরথ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে ডুসেলডফের একটি আলোচনাচক্রে এই মর্মে তুমুল তর্কাতর্কির সাক্ষী ছিলাম। জীবনের শেষ ছত্রিশ বছর (১৮০৭-৪৩) কবিকে যখন এক কাঠের মিস্তিরি তাঁর দুর্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন, হ্যোণ্ডারলীন-বিশেষজ্ঞ পিয়ের বের্তো-র দৃঢ় ধারণা, জগতের সঙ্গে অভিমান করেই কবিকে স্বেচ্ছাঅন্তরীণ হতে হয়েছিল। অন্যদিকে,

চিকিৎসক শাভেহ্বান্ট কবির দ্বিধাবিভক্ত মনের অনপনেয় নিয়তিময়তার কথাই বললেন। শৈশব কৈশোর থেকে ক্রমবর্ধিষ্ণু কল্পচর্চার ফলে চতুর্দিকের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক খুইয়ে বসেছিলেন নাকি হ্যোণ্ডারলীন। আসলে এ দুটি ধারণাই অংশত সত্য। কবিদের কোনো বর্গেই বন্দী করা চলে না। আমাদের এই রূপকে এই দুটি ধারণার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলার চেষ্টা সংবেদনশীলিত পাঠক লক্ষ করবেন।

'দেশ' পত্রিকায় 'জার্মানির চিঠি' রচনাপর্যায়ে হ্যোণ্ডারলীন বিষয়ক প্রতিবেদনের একটি অংশ উপান্ত্য সংলাপে ব্যবহৃত হলো।

[মঞ্চের বাঁ-দিকে একটি বৃত্ত গড়ে, অনেকটা যেন প্ল্যানচেটের ধরনে, ক'জন বসে আছে]

স্লাইড ১
অকূল তরণী, ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসে

স্লাইড ২
হোল্ডারলীনের মা

নারী ॥ হ্যুরটিঙ্গেনে ব্যাকরণের ইশ্‌কুলের পাঠ চুকিয়ে ভেস্কেনডর্ফে আশ্রমিক বিদ্যাপীঠে তাঁকে ভর্তি করানোর মূলে মায়ের ইচ্ছেটা ছিল, ছেলে যেন একদিন দস্তরমতো যাজক হতে পারেন। কিন্তু প্রচলিত কোনো ধর্মের রক্ষাকবচ পরেনি হোল্ডারলীন, কেননা প্রকৃতির দেবায়তনেই তার স্বভাবের মুক্তি। ফুলের নামে ওর নাম। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ডাকে 'হোল্ডার' বলে। 'হলুণ্ডার' বা 'এলড্যার' ফুল থেকেই উঠে এসেছে এই নাম : হোল্ডারলীন।

স্লাইড ৩
একরাশ টিনের কৌটোর মাঝখানে একটি উত্তাল বালক

তরুণ ॥ যখন শুধুই কিশোর ছিলাম,
সে কোন দেবতা আগলে ফিরেছে আমাকে
চীৎকার আর লৌকিকতার মানদণ্ডের থেকে,
তাই বুঝি আমি সহজেই কতো খেলায় মেতেছি
মালঞ্চ মায়ারঙ্গে,
স্বর্গের যতো ঝিরিঝিরি হাওয়া
খেলেছে আমার সঙ্গে।

তুমি যেরকম আনন্দ দাও
কুঁড়িথরোথরো শাখাপল্লবে
যারা কচি কচি হাত মেলে ধরে
তোমার সমীপে

স্লাইড ঃ
কিশোর হোল্ডারলীন

আমারও হৃদয়ে হর্ষ এনেছো
জনক সূর্য ! তরুণ দেবতাসম
ছিলাম তোমার প্রিয়জন আমি
স্বর্গীয় চন্দ্রমা !

ওগো বিশ্বাসী তোমরা সবাই
বন্ধু দেবতা যতো।
যদি-বা জানতে কীভাবে আমার
আত্মা তখন ভালোবেসেছিল তোমাদের।

স্লাইড ৫
উৎস থেকে একটি বালক জল চড়াচ্ছে

সত্যি বলতে তখনো কিন্তু
ডাকিনি কারুর নাম ধরে, তোমরাও
নাম ধ'রে ডেকে ওঠোনি আমাকে, মানুষ যেমন জানত এ ওকে
এক-একটা নামে ডাকে।

তবু রয়ে গেছে মানবসমাজ
তোমাদেরও চেয়ে দারুণ প্রতাপ তার,
আমি তো বুঝেছি ঈথারের নীরবতা,
তবু কোনোদিনও বুঝতে পারিনি মানুষের কোনো কথা।

স্লাইড ৬
পিকাসো-র নীলাক্ত তরুণ

আমি তো পালিত বনকুঞ্জের
শান্ত কোরাসগানে,
ভালোবাসার মন্ত্র পেয়েছি
ফুলের মধ্যখানে

দেবতারা প্রতিপালন করেছে আমাকে তাদের হাতে।

স্লাইড ৭
প্রটেস্টান্ট মঠবিদ্যাপীঠ

দ্বিতীয় স্বর ॥ অথচ মঠের ইশকুলের কড়াকড়ি বেড়েই চলেছিল। পনেরো বছরের ছেলের রুটিনটা এইরকম :

—ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা।

—সওয়া পাঁচটায় ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে প্রার্থনা আর শরীরচর্চা। সংক্ষিপ্ত ব্রেকফাস্টের নামে একটু স্ন্যাপ।

—ভোর ছটায় হিব্রু আর লজিক্।

—সাতটায় ব্যক্তিগত পাঠ ও অনুশীলন।

—সকাল আটটায় হিব্রু।

—নটার সময় ব্যক্তিগত পাঠ ও অনুশীলন।

—সাড়ে দশটায় অনুধ্যান, ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে কোনো অধ্যায়ের পাঠ, ধর্মীয় ভাষণ, ল্যাটিন স্তোত্র গান করে শোনানো।

—এগারোটায় ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঠসমেত মধ্যাহ্নভোজন। অতঃপর প্রার্থনা।

—দুপুর একটায় ব্যক্তিগত অনুশীলন, সংগীতচর্চা।

—দুটোয় গ্রীক ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট, ওভিদ্-এর রচনা থেকে ল্যাটিন চর্চা।

—তিনটেয় ব্যক্তিগত পাঠ ও অনুশীলন।

—বিকেল চারটেয় গ্রীকচর্চা ও অলংকার শাস্ত্রপাঠ।

—বিকেল পাঁচটার সময় ব্যক্তিগত পাঠ ও অনুশীলন।

—সাড়ে পাঁচটায় অনুধ্যান এবং নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে একটি অধ্যায় পাঠ।

—সন্ধ্যা ছটায় রাতের খাবার। সেই সঙ্গে নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে পাঠ।

—রাত আটটায় নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে একটি অধ্যায় পাঠ এবং প্রার্থনা।

—অতঃপর ব্যক্তিগত পাঠ, অনুশীলন। পরিশেষে ঘুমাতে যাবার অনুমতি।

তরুণ ॥ মা, আমাকে তুমি কি এই সংঘারামে রেখে তপস্বী বানাতে চাও? এখানে সারাদিন স্নায়ুর ওপর অত্যাচার চলে। রাত্তিরে যখন স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডার মধ্যে শুতে যাই, তখনো মুক্তি নেই। মুখের কাছে বিছানার

তোষক হিমে জমে যায়। বসন্তকাল এলে ক্বচিৎ কখনো এক ঘণ্টার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি পাওয়া যায়। সেদিন ফিরে আসতে এক মিনিট দেরি হয়েছিল বলে রেক্টর মশাই আমাদের ঘরের মধ্যে কয়েদ করে রাখবেন বলে হুকুম দিয়েছেন।

নারী॥ হোল্ডারলীন, তোমার দায়িত্ব পালন করতে ভুলো না। প্রভু পরম পিতা, তাঁর কাছে তোমার কর্তব্যকাজে হেলা করো না তুমি। তিনি দয়া করলে তবেই পুণ্য। তাই একনিষ্ঠ হয়ে সেদিকে মন দাও।

দ্বিতীয় স্বর॥ মাউলব্রনের কনভেণ্ট বিদ্যায়তনে এসেও নিয়মকানুনের তাড়নায় কঠোর ঈশ্বরের চেয়েও খেয়ালি দেবতাদের কাছে সমানুভূতি খুঁজে চলেছিল হোণ্ডারলীন—

স্লাইড ৮
সূর্যাস্তমথিত গির্জেচূড়া

তরুণ॥ নিঃশব্দ ঈথার জেলে নিরন্তর রেখেছো সুন্দর
সন্তাপে আমার আস্থা। আর ঐ কিরণরশ্মির
সম্মুখে আমার বিক্ষুব্ধ বক্ষ, তবু ক্রমশই
সূর্য দেখি জেগে ওঠে মহত্তর কী এক সাহসে।

প্রিয়তম দেবতারা! কী দারুণ দরিদ্র যে চেনে না জানে না তোমাদের—
তার অন্ধকার মন কখনো পাবে না পরিত্রাণ,
বিশ্ব তার কাছে রাত্রি, আর
বিকাশ পাবে না তার অন্ধকারে আনন্দ বা গান।

তোমরাই যুবগোষ্ঠী তাদের হৃদয় দাও ভরে
যাদের ভিতরে শুধু ভালোবাসা শিশুর মতন মন,
তাদের উদ্বেগে কিংবা ভুলে
কখনো প্রতিভাখানি ম্লান হতে দাও না বিষাদে।

তরুণ॥ মা, আমাকে নিয়ে তুমি ভয় করো না। বিশ্বাস করো, আমার দায়িত্ব থেকে আমি সরে যাব না। তবু একটি আশ্চর্য ঘটনা আমাকে যেন সৌভাগ্যে ভরে দিতে চাইছে। গ্রামের পুরোহিত হলে জগতের উপকারে লাগা যায় ঠিকই। কিন্তু তার চেয়েও ভাগ্যবান বোধহয় সে-ই যার···

দ্বিতীয় স্বর॥···চিঠিতে একথাটা শেষ করতে পারেনি তরুণ কবি। মঠের পরিচালকের কন্যা লুইসে-র ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে একই বছরে যাঁর জন্ম সেই কবি, প্রকৃতির নারীশ্বরী লুসি-র মতোই পেয়ে গেছেন লুইসে-কে। কবির দেওয়া নাম 'স্টেলা'।

তরুণ॥ তুমি তো জীবন খোঁজ; আর ছলকায় আভাময়
আগুন, মাটির খুব নিচু থেকে তোমাদের উদ্দেশে,
আর তুমি নিবিড় আবেগে
নিজেকে নিক্ষেপ করো এট্‌নার আগ্নেয় অন্তর্দেশে।

মিশর সাম্রাজ্ঞী জানি সরোষে সমস্ত মুক্তারাশি
সুরাপাত্রে নিমজ্জিত করে গেছে—কিন্তু তুমি কেন?
কী করে তোমার মহত্তর
নিজস্ব সত্তার তুমি সঁপে দিলে জ্বলন্ত কটাহে?

স্লাইড ৯
লুইসে নাষ্ট-এর প্রতিকৃতি

দ্বিতীয় স্বর॥ লুইসে তার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছে কবিকে। সে দখল করে নিতে চায় কবিকে, তার অস্থাবর সত্তাকেও পরিণত করতে চায় স্থাবর সম্পত্তির নিরাপত্তায়। তার মা-ও খুব খুশি। বেশ মানাবে দুজনকে। বিয়ের পর হোল্ডারলীন কোনো-একটা গ্রামে প্রোটেস্টাণ্ট পুরোহিতের চাকরি পেয়ে যাবে, আর তার মেয়ে সামলাবে ঘর-সংসার। সুখী হতে গেলে আর কী লাগে? না-না, এই বন্ধনের মায়াজালে আবদ্ধ হতে রাজি নয় কবির হৃদয়। মায়াবী সন্ধ্যার একাকিত্বে সে খুঁজে চলেছে উত্তরণ—তাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

স্লাইড ১০
বর্ণিল সমুদ্র

তরুণ কণ্ঠ॥ চাষী তার ছায়াচ্ছন্ন কুটিরখানির পুরোভাগে
বসে আছে তৃপ্ত। আর চুল্লী থেকে ওঠে ধূম্রজাল,
পথিক আতিথেয়তা খুঁজে পায় দিনান্তক্ষণের
ঘণ্টা শুনে সমাহিত পল্লীর ঘনিষ্ঠ পরিবেশে।

কোরাস॥ এখন কি নাবিকদল ফিরেছে বন্দরে।
দূরের নগরে আর বাজারেও ফূর্তির ফোয়ারা
ক্ষীণতর হয়ে আসে ; শান্তিময় নিকুঞ্জকাননে
উৎসবের উপচার স্মিত চোখে দেখে অতিথিরা।

তরুণ॥ কিন্তু কী আমার জন্যে ? নশ্বর মানুষ বেঁচে থাকে
কর্ম ও মহার্ঘ ভাতা নিয়ে। শ্রমে-বিশ্রামের তালে
সবাই তো সুখে আছে : তাহলে যন্ত্রণা নিদ্রাহীন
কেন জাগে হৃদয়ে আমার।

কোরাস॥ চৈত্রের মুকুল ছায় সন্ধ্যার গগনে,
গোলাপ—গোলাপ কতো, হিরণ্যভুবন
সৌম্যতায় জেগে ওঠে ; আরক্তিম মেঘসংঘ,
আমাকে উত্তীর্ণ করো ঐখানে সমূর্ধ্ব দ্যুলোকে

তরুণ॥ লুপ্ত হোক আমার বিষাদ, প্রেম আলোয়, হাওয়ায়!
অথচ এখনই দেখি আমার বিমূঢ় প্রার্থনায়
সন্ত্রাস উঠেছে জেগে। আঁধার ঘনায়, নভোতলে
আমি ফের পড়ে থাকি একা।

কোরাস॥ হোল্ডারলীন, হোল্ডারলীন, তোমার জন্য দেহমনের নৈবেদ্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে লুইসে, তোমার স্টেলা। তাকে তুমি শেষ পর্যন্ত কী-চিঠি লিখেছো? তুমি পলাতক, সুযোগসন্ধানী!

তরুণ॥ ধন্যবাদ, লুইসে, তোমার কোমল সান্ত্বনামাখা চিঠিগুলির জন্য অজস্র ধন্যবাদ! তোমার দেওয়া ফুলগুলি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এই নাও, আমাকে দেওয়া তোমার অঙ্গীকারের অঙ্গুরীয় আর তোমার চিঠিগুলি। ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত ঐসব চিঠি আমাদের ভালোবাসার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক। লুইসে, আমার স্টেলা, তোমার কাছে আমার অক্ষমতা আমি লুকোতে চাইনে। আমার মনের দুর্জয় বিষাদের ধর্ম আসলে যে আমার অতৃপ্ত উচ্চাশারই লক্ষণ। কথাটা শুনে তুমি হেসে উঠো না, লুইসে। যদি সেই উচ্চাশার পূরণ হতো, তাহলে হয়তো ফূর্তিবাজ আর স্বাস্থ্যময় হয়ে উঠতাম আমি। কিন্তু তার তো কোনো আভাস দেখছি না। তাই আমার চিন্তাধারা দ্রুত পালটে নিতে হয়েছে আমাকে। তোমার আর আমার সম্পর্ক অন্য

সুরে বেঁধে নেওয়ার কথা আমাকে ভাবতে হয়েছে। আমি তোমাকে কোনো বাঁধনে জড়াতে চাই নি। জানি না, আমার চিরন্তন দুরাশা কখনো সফল হবে কিনা। সেই রূপান্তর না ঘটলে তোমাকে আমি কোনোদিনই সুখী করতে পারব না। তোমাকে প্রার্থনা করে অনেক প্রেমিকের দল, তুমি তাদের মধ্য থেকে কারুকে নির্বাচন করে নাও।

কোরাস॥ আমরা জানি হোল্ডারলীন, তোমার ঐ দুরাশা স্বর্গীয়। আমরা জানি তোমার উচ্চাশা পার্থিব নয়। কবিতার যজ্ঞে তুমি অস্তিত্বের সমস্ত অর্জন অরণির মতো অর্পণ করে দিতে চাও তুমি। এই তোমার নিয়তি, নিজের হাতে গড়ো নিজস্ব নিয়তি।

স্লাইড ১১
ল্যাটিন আমেরিকার নিঃসঙ্গ এক বৃক্ষ

তরুণ॥ একটি চৈত্রের উত্তরাধিকার, সর্বশক্তিমান,
শুধু এক শরতের গানে তীব্র নিখাদ ঝংকার,
মায়ার খেলার শেষ তৃপ্ত অবসন্ন মন আমার,
এইবারে হতে পারে অসংকোচে ইচ্ছানির্বাণ।
লুপ্ত করে দিয়েছিল সত্তার অমল অধিকার
নারী এক, মৃত্যুতেই পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা।
একটি গীতিকবিতা ঘনিয়েছে অন্তরে আমার,
হোক তা সম্পূর্ণ হোক, স্তোত্রের মতন সুরচিত।
তারপর পাতালের মৌন ছায়াকেও স্বাগতম্।
সানন্দে সেখানে যাব, বীণাযন্ত্র আমার পিছনে
পড়ে রবে, আমি তবু একবার বেঁচেছি দুর্গম
দেবতার মতো, তবে আর কিছু চাইনে জীবনে।

স্লাইড ১২-১৩
হেগেল, শেলিং প্রমুখ সতীর্থের প্রতিকৃতি

দ্বিতীয় কণ্ঠ॥ ট্যুবিঙ্গেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন হোল্ডারলীন। চ্যান্সেলারের দুহিতা এলিজে-র সঙ্গে যেন ছায়াপথে বিনিময় হল। কিন্তু কবির মন সেখানেও নিবদ্ধ নয়। তাকে ঘিরে আছে থিওলজিক্যাল সেমিনারির পড়ুয়া বাসিন্দারা, তাঁরা তাঁর বন্ধু। তাঁদের মধ্যে আছেন হেগেল,

শেলিং, ম্যোরিকে এবং আরো কতো বিশ্বভাবুক। এঁদের নিয়ে হোল্ডারলীনের আড্ডা আলাপের বিষয় ছিল ঈশ্বর এবং বিশ্ব, মানুষের চেতনা এবং জগতের সম্পর্ক।

হেগেল ॥ ব্যাপারটা নিতান্ত সোজা
এইখানে
বিষয়ী হচ্ছে মানুষ
ঐখানে
তার বিষয় : বিশ্ব
আর বিশ্বের অস্তিত্বে
ঢুকে যাচ্ছে চৈতন্য—
আর আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেই তো
জগদ্ব্যাপারটা হয়ে উঠছে
শুদ্ধ জ্ঞান
এইভাবে আত্মচেতন হয়ে
জগৎটা আমাদের চৈতন্যে
নিত্যনতুন প্রক্রিয়ার পরম্পরা জাগাচ্ছে আর-কি। [নস্যি নেয়]

হোল্ডারলীন [পাইপ হাতে] ॥ দেখছ তোমরা, হেগেল কেমন
জ্ঞান দিচ্ছেন আমাদের, যদি
তোমরা না জানো মানুষ এবং
জগতের গূঢ় দুরূহ তত্ত্ব,
বন্ধু হেগেল দেবেন সুমতি।

হেগেল ॥ হোল্ডারলীন, তোমারও জীবনে
কিংবা তোমার শিল্পেও এই
পারস্পরিক যোগসূত্রটা…

আরেক ছাত্র ॥ আর ঈশ্বর? তাঁর কী ভূমিকা?
—এই দেখো না আমাদের সেনেট রায় দিয়েছেন, এখানকার বৃত্তিভোগী ছাত্রেরা গোড়া থেকেই নিজেদের এমন ভাবে তৈরি করে নেবেন যার ফলে তাঁরা কোনোরকম প্রলোভনের ফাঁদে না পড়ে যান। ভুলে গেলে নাকি চলবে না, তাঁদের—অর্থাৎ আমাদের—একমাত্র উপায় শৃঙ্খলা ও একমাত্র উদ্দেশ্য নাকি ঈশ্বর-সমীহা!

হোল্ডারলীন ॥ সন্ন্যাসীর কালো পোশাক পুরোহিতের উত্তরীয় গায়ে
আমরা যাই চার্চে, আবার সেই আমরাই রাতের অধ্যায়ে
একই পোশাক চাপিয়ে যাই সরাইখানায়, নিসর্গভ্রমণ,
দেবতারাও সঙ্গে চলেন, ঈশ্বর কি কষ্ট পান না মনে?

[বাইরে উত্তেজনা। বেয়ারার মতো একজন ঢুকে পড়ল প্রথমে]

বেয়ারা ॥ স্বয়ং চ্যান্সেলার আর ইউনিভার্সিটির
প্রিফেক্ট আসছেন
আপনাদের মধ্যে কে-কে লিখেছেন দেয়ালে :
'বিপ্লবের জয় হোক' 'ফরাসী বিপ্লব জয়ী হোক
জার্মানিতে'—কেন যে এসব
লিখতে যান—চ্যান্সেলার, মানে আপনাদের
ব্যারন মশাই খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন,
তিনি রাগ করলে তো প্রিফেক্টেরও রাগা স্বাভাবিক।

[ব্যারণ তথা চ্যান্সেলার এবং প্রিফেক্টের সদলবলে প্রবেশ]

প্রিফেক্ট ॥ তোমাদের মধ্যে কার এত সাহস, দেয়ালে এসব অশ্লীল কথা লিখেছো

হোল্ডারলীন ॥ এ আমারই কাজ। [শ্যোলিং তার মুখে হাত চাপা দেয়]

প্রিফেক্ট ॥ দুষ্কৃতকারীকে দাও, হাজতে ভুগুক,
যেমন হ্যোল্ডারলীন তোমাকেও ক'দিন আগেই
বৈপ্লবিক চালচলনের জন্য ইউনিভার্সিটির জেলখানায়
ভুগতে হয়েছে, মনে আছে?

ভিড়ের মধ্য থেকে ॥ সিনক্লেয়ার, সিনক্লেয়ার—এটা তারই কাজ।

প্রিফেক্ট ॥ অভিজাতবংশের ছেলে সিনক্লেয়ার, তাছাড়া শ্রীমান্
আইন অধ্যয়ন করছ—তুমি কেন বাপু
একাজ করতে গেলে? তোমার বাপের কানে গেলে
কী হবে বলো তো?

ব্যারন ॥ কী হে সিনক্লেয়ার, তুমি—তুমিই তাহলে
কুকর্ম করেছ?

হোল্ডারলীন ॥ আমরা সবাই। [শ্যোলিং তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করে]

প্রিফেক্ট ॥ কোথায় ফরাসি দেশ আর কোথা জার্মানি স্বদেশ!
ফরাসি বিপ্লব নাকি উপপ্লব তার সংক্রামণ

তোমাদের মধ্যে কেন? সদয় ব্যারন বাহাদুর
শৃঙ্খলা কর্তৃত্ব আর নিয়মানুবর্তিতা সততা
পছন্দ করেন। তাই এই শ্রীমান জেলখানায় যাবে।

[সিনক্লেয়ারকে টেনে নিয়ে চলে যাওয়া হয়]

প্রিফেক্ট ॥ (হোল্ডারলীনের দিকে তাকিয়ে)
আর এ বিচারপর্ব শেষ হলে
বৃত্তিভোগী হোল্ডারলীন
ছ'ঘণ্টা তোমাকে যেন রাখা হয় জেলখানায় পুরে।
তারপর দেখা যাবে জলপানি পাও কি না পাও।
লাঠিটা দাও তো [তাকে লাঠি এগিয়ে দেওয়া হয়] বলো, এবার তাহলে,
তোমরা গড়েছ নাকি গুপ্তসংঘ এক?

একজন ॥ হ্যাঁ।

প্রিফেক্ট ॥ গুপ্তসংঘের নাম?

হোল্ডারলীন ॥ 'হার্মনিস্ট্স', তার মানে আমরা
ঐকতানের দল। কোনো বাধা বন্ধন মানি না
সমস্ত সবার সঙ্গে মিলে যাক, সেই সাম্য চাই।

প্রিফেক্ট ॥ কারা কারা সদস্য? কজন?

হোল্ডারলীন ॥ যোহান ক্রিস্টিয়ান ফ্রিডরিশ্, হোল্ডারলীন।

প্রিফেক্ট ॥ এটা তো তোমারই নাম, এমনভাবেই বললে যেন
চারজন লোক! আর কারা আছে? কারা কারা আছে?

ভিড়ের মধ্য থেকে ॥ হেগেল, শেলিং।

প্রিফেক্ট ॥ রাজাকে করেছে হত্যা বিপ্লবীরা— এটা তোমরা সমর্থন করো?

হেগেল ॥ হত্যার জন্যই হত্যা সমর্থন করি না আমরা।

[একজন গান ধরে, তাকে প্রিফেক্ট ঘা বসাতে থাকে]

একজন ॥ স্বেচ্ছাচারীরা দুনিয়ায় যতো
প্রতিহিংসায় প্রহর ঘনায়
তোমাদের দিন হল অপগত
জনতা এখন প্রতিশোধ চায়। [প্রিফেক্টের প্রহার]

প্রিফেক্ট ॥ আর ঐ আহামরি মার্সেঈ-এর গান,
সেটাতেও করো কণ্ঠদান?

ভিড়ের মধ্য থেকে ॥ গানটা নাকি ফরাসি থেকে ফিলসফির ছাত্র শেলিং
জার্মানে তর্জমা করেছে। প্রিফেক্ট মশায় ওকেও শাস্তিদিন।

[সদয় ভঙ্গিতে ব্যারন উঠে]

এখানে শুনানী শেষ। শিক্ষাবিধি আর
আইনকানুন মানো, রাষ্ট্র আর প্রথার
বিরুদ্ধে যেয়োনা তোমরা, খৃস্টধর্ম আর
রাষ্ট্রই শালীনতার সুসংক্ষিপ্তসার। [সদলবলে বিদায়]

সবাই ॥ মুক্তিবিপ্লব জিন্দাবাদ
ডিউকতন্ত্র হোক নিপাত
পুঁজিপতির বিত্ত নাও
দিনমজুরকে শক্তি দাও
গণতন্ত্র জিন্দাবাদ
Vive la liberte Vive la liberte
ভিভ্ লা লিবার্তে ভিভ্ লা লিবার্তে

হোল্ডারলীন ॥ আর সহ্য করব না এই যুগ যুগ ধরে
বালকসুলভ চলা, কারাগারে বন্দী মানুষের
মেপে-মেপে পূর্বনির্ধারিত পদক্ষেপে
প্রতিদিন ঘুরে চলা, আমি আর সইব না কখনো।

কোরাস ॥ তুমি কী চাও, হোল্ডারলীন?

স্লাইড ১৪
মেঘসিন্ধু

হোল্ডারলীন ॥ গণকণ্ঠ, তুমি দেবতার স্বর, বিশ্বাস করেছি
তরুণ বয়সে, আজও একই কথা অঙ্গীকার করি।
আমাদের স্বরচিত ধ্যানধারণার কোনো পরোয়া না করে
সেই স্রোত—গণকণ্ঠ—বহে যায় তবুও তা ব'লে

কে তাকে ভালোবাসেনা, সেই-ই তোলে হৃদয়ে স্পন্দন
আমি ঐ দূর থেকে শুনি তার ধ্বনি,
আমাকে নেয় না তার অন্তর্গত করে, তবু জানি
সেই নদী সমুদ্রে চলেছে।

আত্মবিস্মৃতির ছন্দে সপ্রতিভ চলেছে কল্লোল
দেবতার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করে ধারা,
নশ্বরের-ও ইচ্ছা সে-ই পূর্ণ করে, জাগর দৃষ্টিতে
নশ্বর মানুষ যদি সেই স্রোত জীবনে জড়ায়।

এক মুহূর্তই যায় মহাকাশে ; এইভাবে ধায়
নিম্নপানে—শান্তি খোঁজে, তীব্র তবু ছোটে,
ইচ্ছারও বিরুদ্ধে যায় ছুটে যায়, এক খাড়িতে
শিখর থেকে শিখরে, অবিরল নিহাল সংকটে।
[মঞ্চে একটুখানির জন্য অন্ধকার]

নারী ॥ হোল্ডারলীন তোমাকে আমি প্রোটেস্টান্ট পুরোহিত করব বলে সেমিনারিতে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন তুমি এ কোন পথে চলেছ?

হোল্ডারলীন ॥ আমি আইন পড়তে চাই মা, মানুষের ন্যায্য অধিকার বজায় রাখতে চাই। দেখো তুমি, পরে, ভবিষ্যতে, তোমারও কতো ভালো লাগবে, যখন দেখবে আমি মানুষের উপকারে লেগেছি।

নারী ॥ হোলডার, ফ্রান্সের বিদ্রোহ তোমার মাথাটা ঘুলিয়ে দিয়েছে। ভেবে দেখেছ, জার্মানিতে তার কুফল ফলতে পারে? এসব বাজে জিনিসের মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছ কেন? পরমপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, এই অসুখ যেন আমাদের দেশটাকে গ্রাস না করে।

হোল্ডার ॥ মা, কী বলছ তুমি? ওটা অসুখ নয়, বিপ্লব। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ এই বিপ্লবের লক্ষ্য।

নারী ॥ আমাদের কাছে ওটা অসুখের উপসর্গ ছাড়া আর কী! জার্মানিতে আমরা আছি পরম স্বস্তিতে। অস্বস্তির আমাদের দরকার নেই বাপু।

হোল্ডার ॥ আর সাধারণ মানুষের মৌল অধিকার! তার কথা তুমি কি ভেবে দেখেছ মা?

নারী ॥ সাধারণ মানুষের অধিকার এখানে, এখন আমাদের দেশে ভালোভাবেই বজায় আছে।

হোল্ডার ॥ মা, তোমার যদি সেই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে থাকে তবে সেটা ভুল। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের সাধারণ অধিকার বলতে কিছু নেই। তাদের টিঁকে-থাকাটা স্বৈরাচারীদের দয়ার ওপর নির্ভর করে।

হোল্ডারলীন (পঞ্চান্ন বছর বয়সে)

আত্মবিস্মৃতির ছন্দে সপ্রতিভ চলেছে কল্লোল
দেবতার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করে ধারা,
নশ্বরের-ও ইচ্ছা সে-ই পূর্ণ করে, জাগর দৃষ্টিতে
নশ্বর মানুষ যদি সেই স্রোত জীবনে জড়ায়।

এক মুহূর্তই যায় মহাকাশে ; এইভাবে ধায়
নিয়মানে—শান্তি খোঁজে, তীব্র তবু ছোটে,
ইচ্ছারও বিরুদ্ধে যায় ছুটে যায়, এক খাড়িতে
শিখর থেকে শিখরে, অবিরল নিহাল সংকটে।
[মঞ্চে একটুখানির জন্য অন্ধকার]

নারী ॥ হোল্ডারলীন তোমাকে আমি প্রোটেস্টাণ্ট পুরোহিত করব বলে সেমিনারিতে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন তুমি এ কোন পথে চলেছ ?

হোল্ডারলীন ॥ আমি আইন পড়তে চাই মা, মানুষের ন্যায্য অধিকার বজায় রাখতে চাই। দেখো তুমি, পরে, ভবিষ্যতে, তোমারও কতো ভালো লাগবে, যখন দেখবে আমি মানুষের উপকারে লেগেছি।

নারী ॥ হোলডার, ফ্রান্সের বিদ্রোহ তোমার মাথাটা ঘুলিয়ে দিয়েছে। ভেবে দেখেছ, জার্মানিতে তার কুফল ফলতে পারে ? এসব বাজে জিনিসের মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছ কেন ? পরমপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, এই অসুখ যেন আমাদের দেশটাকে গ্রাস না করে।

হোল্ডার ॥ মা, কী বলছ তুমি ? ওটা অসুখ নয়, বিপ্লব। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ এই বিপ্লবের লক্ষ্য।

নারী ॥ আমাদের কাছে ওটা অসুখের উপসর্গ ছাড়া আর কী ! জার্মানিতে আমরা আছি পরম স্বস্তিতে। অস্বস্তির আমাদের দরকার নেই বাপু।

হোল্ডার ॥ আর সাধারণ মানুষের মৌল অধিকার ! তার কথা তুমি কি ভেবে দেখেছ মা ?

নারী ॥ সাধারণ মানুষের অধিকার এখানে, এখন আমাদের দেশে ভালোভাবেই বজায় আছে।

হোল্ডার ॥ মা, তোমার যদি সেই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে থাকে তবে সেটা ভুল। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের সাধারণ অধিকার বলতে কিছু নেই। তাদের টিঁকে-থাকাটা স্বৈরাচারীদের দয়ার ওপর নির্ভর করে।

হোল্ডারলীন (পঞ্চান্ন বছর বয়সে)

নারী ॥ হ্যোল্ডার, তুমি বদলে গেছ। আগে তুমি কখনো আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে না।

[পাশ থেকে আসে হ্যোল্ডারলীনের বোন, তেরো-চোদ্দ বছর বয়স]

মেয়েটি ॥ কিন্তু হ্যোল্ডারলীন, তুমি আমার দাদা বলেই তোমার সব কথা মেনে নেওয়া যায় না। আমায় সত্যি বলো তো, মাথার উপর রাজা না থাকলে কি বিদ্রোহ করা যায় ?

হ্যোল্ডার ॥ [সস্নেহে] উলরিকে, আমার ছোট্ট বোন, যদি দুনিয়ায় আর সবি ভুল ব'লে প্রমাণ হয়, একটা কথা অন্তত সত্যি বলে ধরিস—সেটা হল এই যে জেলখানা ভেঙে দিতে পারে জনতা, যাদের নাকি নিচুশ্রেণীর লোক বলা হয়। আর জেনে রাখিস, উলরিকে, ফ্রান্সে মূক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হলে ধিকিধিকি সেই মুক্তিস্পৃহার দাবানল দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়বে, দিক থেকে দিগন্তরে !

মেয়েটি ॥ আমার কিন্তু বড়ো ভয় করে।

হ্যোল্ডারলীন ॥ স্বাধীনতার সামনে ভয় কী রে বোন।

[মঞ্চে আলো বেড়ে যায়]

দ্বিতীয় স্বর ॥ হ্যোল্ডার বদলে গিয়েছে বলছে সবাই। ট্যুবিঙ্গেনে রীতি হল বৃত্তিভোগী ছাত্রদের দেখলে লোকেরা মাথার টুপি নামিয়ে অভিবাদন করবে। সেদিন একটা লোক কী করেছে, ওকে দেখে টুপি নামিয়ে কুর্ণিশ করেনি বলে তাকে ধরে হ্যোল্ডারলীন এমন মার দিয়েছে যে ওকে ভাইস চ্যান্সেলার শেষ পর্যন্ত করে শাস্তি দেন।

কোরাস ॥ বন্দী হতে ভালো লাগে হ্যোল্ডারলীনের, তাহলেই নাকি মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দেওয়া যায়। খণ্ড খণ্ড জার্মানিতে ঘুরে বেড়াতে চায় হ্যোল্ডারলীন, এক করে দেবার সংকল্পে। এই তো সেদিন রেগেন্‌স্‌বুর্গে গিয়েছিল। সেজন্য পাশপোর্টের দরকার পড়েছিল ওর। জানো মেয়র মশাই ওকে কেমন পাশপোর্ট দিয়েছিলেন ? পাশপোর্ট না তো, হুঁশিয়ার !

দ্বিতীয় স্বর ॥ সে আবার কেমন ? মেয়র কী বলেছিলেন ?

কোরাস ॥ খুব সাবধান
লোকটার নাম হ্যোল্ডারলীন
ছ' ফুট উঁচু

বাদামি চুল
মন-মজানো উঁচকপালে
বাদামি ভুরু বাদামি চোখ আ-ঋজু নাসা
হাঙা চোয়াল
ডোল চিবুক
মানানসই মাঝারি মুখ—
লোকটার নাম হ্যোল্ডারলীন।
খুব সাবধান! খুব সাবধান!
থিরথিরে ঠোঁট
বিষম দাঁত
বাদামি দাড়ি
ঠিক বত্রিশ বছর বয়স
এই শরতে সফর করবে
লোকটা যাবে স্যাটিঙ্গেন থেকে এবং
ব্লাউবয়রেন—উলম্ হয়ে
রেগেন্‌স্‌বুর্গ পর্যন্তই!
সপ্তাহ চার মেয়াদমূল্য
এরি মধ্যে ফিরতে হবে বলা বাহুল্য—
খুব সাবধান! হ্যোল্ডারলীন!
এই শরতে নাগরিকদের নগরশালীন
করে ছাড়ব, তা নাহলে
পৌরপিতা অভিধা আমার গৌরবহীন।
খুব সাবধান! লোকটার নাম হ্যোল্ডারলীন!

আপন স্বদেশ' শীর্ষক এই
কবিতাটির ফিল্মভাষ্য

হ্যোল্ডারলীন॥ সুদূরের দ্বীপ থেকে প্রসন্ন নাবিক ফিরে আসে
আপন ঘরের দিকে শ্রান্ত স্রোতে শস্যের তৃপ্তিতে,
আমিও ফিরতে চাই তার মতো আপন স্বদেশে;
অথচ বিষাদ ছাড়া কী শস্য আমার সংকলিত?

প্রিয় তটরাশি, যারা আমাকে পালন করেছিলে,
শান্ত কি করতে পারো প্রেমের যন্ত্রণা? তোমরাও,
শৈশবের বনরাজি, আসব যখন আমি ফিরে,
আরো একবার সেই প্রশান্তি আমাকে দেবে নাকি?

স্নিগ্ধ ঊর্মিমালা আনো, হে আমার দরদিয়া নদী,
দেখেছি তোমার বুকে বহে যায় জাহাজপ্রবাহ,
দাঁড়াব সেখানে আমি, হে আমার প্রিয় গিরিরাজি,
তোমরাই আমাকে আগলেছিলে, মাতৃকাভূমির

সুচির সীমান্তরেখা! জননীর ভবন আমার,
সোহাগ-ঝরানো ভাইবোন, আমি ত্বরিতে জানাব
বিনতি সবার প্রতি, তোমরা আমার
হৃদয় জুড়াবে জানি সহৃদয় স্নেহ শুশ্রূষায় –
তোমরা প্রত্যয় ধ্রুব! তবু আমি ধ্রুব এই জানি
একটি যন্ত্রণা শুধু কখনোই হবে না শমিত,
ক্ষণপ্রভা সান্ত্বনার ঘুম পাড়ানিয়া গানে-গানে
মেটাতে অক্ষম সেই বিষয় যা প্রেমের প্রণীত।

ঊর্ধ্ব থেকে তোমরা যারা ঋণ দাও স্বর্গীয় আগুন,
পবিত্র সন্তাপ দাও সত্তার অমল উপহার—
তবে তাই হোক, আমি শুধু এই ধরিত্রীর এক
জাতক, জন্মেছিলাম ভালোবেসে দুঃখ পাব বলে।

দ্বিতীয় স্বর॥ 'হাইপীরিয়ন' উপন্যাসের দুই খণ্ডে তোমার ভালোবাসার এই দুঃখ তুমি ফুটিয়ে তুলেছ। তুমি সেখানে জার্মানিকে মিলিয়ে দিয়েছ গ্রীসের সঙ্গে। গ্রীক তরুণ হাইপীরিয়ন আসলে তো তুমিই, তোমারই সত্তার অভিক্ষেপ, দেশকে আর নারীকে ভালোবাসা যে মিলিয়ে নিয়েছিল। হাইপীরিয়ন, তরুণ সন্ন্যাসী, বন্ধু আলাবান্দার প্রবর্তনায় গ্রীসের হয়ে ঔপনিবেশিক তুর্কীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আর দ্বিতীয় খণ্ডে তার প্রেমিকা দিওতিমার কাছে সমুদ্রে মৃত্যুর মধ্য

দিয়ে উৎসর্গ ঘটাবার কথা সে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় দিওতিমার মৃত্যু হলে হাইপীরিয়ন বৈরাগী হয়ে গিয়েছে—প্রকৃতির সহমর্মিতায় নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়ে।

কোরাস ॥ কে, কে এই দিওতিমা ?

স্লাইড ১৫
স্যাশেৎ গণ্টার্ড-এর মিতালেখা

দ্বিতীয় স্বর ॥ দিওতিমা প্লেটোর বর্ণিত আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতিমা, যে আমাদের শুদ্ধ করে। হোল্ডারলীনের দিওতিমা আসলে ফ্রাংফুর্টের ব্যাংকের মালিক জে. এফ. গণ্টার্ডের স্ত্রী। তাঁদের সন্তানের গৃহশিক্ষক হয়ে এসে স্যাশেৎ সেই নারীকে ভালোবাসলেন হোল্ডারলীন। সেই প্রণয় তাদের দুজনকে নিয়ে গেল দিব্য ট্র্যাজিডির দিকে।

হাইপীরিয়ন [হোল্ডারলীন] ॥ যদি জানতাম দিওতিমা কোথায়, তাহলে সন্ন্যাসীর ভিক্ষুঝুষ্টি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। আমাদের হৃদয়ের মূল মাতৃভূমির দিকে ঈগলের মতো উড়ে যেতাম···মনে হয় আমি অন্য জগতের নাগরিক, তাই তুচ্ছ অনেক কিছুই আমি অনায়াসে উপেক্ষা করে যেতে পারি। দিওতিমা আর আমি অন্যরকম গান গাই, আরেক দেশ ও কালের পবিত্র উৎসবে মেতে উঠি, প্রাচী আর প্রতীচীর সাহসিক পুরুষদের স্তবে মজে যাই···যে-ঈথার আমাদের ঘিরে আছে, সেই কি আমাদের পরিশুদ্ধ করে তোলে না, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়ে দেয় না আমাদের ?

দিওতিমা [স্যাশেৎ] ॥ বিদায়, হাইপীরিয়ন, বিদায়। তোমার চেতনার ব্রতযাত্রাকে সম্পূর্ণ করে তোলো। তোমাদের ঐ যুদ্ধ, মুক্তির মন্ত্রণায় ঐ সংগ্রাম, দ্রুত শেষ করে এগিয়ে যাও আরো বৃহত্তর সেই শান্তি—সেই সোনালি শান্তির সৌজন্যে। তুমি তো আমায় বলেছিলে, সেটাই একদিন লেখা থাকবে শাশ্বত ন্যায়ের গ্রন্থে, যার মধ্যে স্বর্গীয় প্রকৃতির কথা লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে, মানুষের কেন্দ্রে সেই গ্রন্থসংরক্ষিত হবে। বিদায়, হাইপীরিয়ন।

মৃত স্যাশেৎ গণ্টার্ডের (দিওতিমা) মুখচ্ছবি

হাইপীরিয়ন ॥ নিঃশব্দে তুমি কী বহো, ওরা কিছু বুঝতে পারে না,
ওগো অপ্রতিম প্রাণ ! পৃথিবীর দিকে
নীরবে তাকাও তুমি, আর অহেতুক
আত্মীয় সূর্যের দ্যুতি অনুভব করো !

রানী তুমি, দেবগোত্র। তুমি
চন্দ্ররশ্মি জেলে ধরো আতিথেয়তায়,
ফেলে-আসা সেইসব দিন সেই প্রেমে উদ্ভাসিত
হতে পেরেছিল। সেই ভবন সবার স্বর্ণসম

সুদীপ্ত ধারায় আজো আমারও হৃদয়ে মর্মরিত ;
কৃতজ্ঞ হৃদয়, যারা মৃত্যুর ভিতরে অর্থ খোঁজে,
পাতালেও আনন্দের স্রোত যারা বয়ে নিয়েছিল
সেই সব দেবতার সঙ্গে তুমি আনো সগোত্রতা।

সেই কমনীয় দীপ্তি ভুলে গেছে আজকে সকলে,
নিঃসঙ্গ এখন তুমি, শুধু বেঁচে থাকো
উদ্ভাসিত অতীতের অনুধ্যানে সেই সব নক্ষত্রের মতো
যারা আজ অন্তর্হিত, যারা শুধু আজ গেয়ে চলে
শোকগাথা, যার অর্থ নিদ্রাশেষে স্বল্প জাগরণ।
সময় শুশ্রূষা আনে জানি। আর জানি
নতুন দেবতারাও জেগে ওঠে নূতন প্রতাপে।
নিসর্গ কী করে তবে নিজস্ব ক্ষমতা ভুলে যাবে ?

হে প্রেম, নিসর্গ দেবে আরেক রাজ্যশ্রী আমাদের
পথ ফুরোবার আগে। সেই দিন আমার নশ্বর এই গান
দেখবে, হে দিওতিমা, তোমাকে বীর ও দেবতার
নামে নামাঙ্কিত করে তোমাকেই করে মুকুর্বিত।

[মঞ্চের দু'প্রান্তে দু'জন দাঁড়িয়ে দর্শকদের সম্বোধন ক'রে স্বগত বলছে]

দিওতিমা ॥ তুমি আমাকে বলেছ আমার ভাবনা আর চিন্তাগুলোকে শব্দে গেঁথে তুলি। আমার চেতনা তো তোমার সত্তায় প্রতিফলিত। তোমাকে

আমি তাই দিই যা নিজে থেকেই গড়ে ওঠে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য আমি কি তোমায় দিতে পারতাম? সেই অর্চনাই আমি তোমাকে দিই যা আমার আত্মপ্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো।

হাইপীরিয়ান॥ আমি একদিন স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সমুদ্রের ওপারে সত্য খুঁজে পাব বলে।

দিওতিমা॥ আমারও হৃদয় নতুন ভাবনার উদ্দীপনায় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন।

হাইপীরিয়ন॥ তোমাকে, শুধু তোমাকেই আমি পেয়েছি।

দিওতিমা॥ আমরা নিজেরা কিছু নই—আমাদের খুঁজে চলাটাই সব।

হাইপীরিয়ন॥ এখন সেই পরম অজ্ঞাত সত্য বেরিয়ে আসুক, যা আমাকে জীবন দেবে, অথবা মৃত্যু।

দিওতিমা॥ তোমাকে লিখতে গিয়ে আমি ভুল করে 'নিয়তি' শব্দটা লিখে ফেলেছিলাম। অনুতাপে আমি মরে যাচ্ছি এখন। ঐ সংকীর্ণ, ঠাণ্ডা শব্দটা আমার আদৌ ভাল লাগছে না, নিরন্তর আমায় কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। তবু, ছোটো-ছোটো বিষয়গুলির পারম্পর্যেই কি সেই রহস্য গড়ে ওঠে না যাকে আমরা নিয়তি বলি? সেটা তো অনিবার্য। অদূরদৃষ্টির বশে আমরা আগে থেকে তার ধরণটা ঠাহর করতে পারিনা। যা ভেবে রাখি তাকে অন্য রূপে দেখলেই আমরা শিউরে উঠি। কিন্তু প্রকৃতি তার নিজের নিয়মের শৃঙ্খলা নিয়ে চলেছে যার অতল গহন আমরা ধরতে পারিনা। আর সেটাই কি সান্ত্বনা জোগায় না? নিয়তি কি তাই নয় যা যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়—যাকে আশাও করিনি, অথচ মনের দুরান্তিকে তার জন্য আমাদের প্রত্যাশা পুঞ্জিত হয়েছিল?

হাইপীরিয়ন॥ কথা বলতে গিয়ে আমি পারছিনা, ভাষা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। মানুষেরা তো কথা বলে, জল্পনায় মাতে পাখিদেরই মতো, যতোক্ষণ তাদের মধ্যে চৈত্রপবন বয়। কিন্তু মধ্যদিন আর সন্ধ্যার মধ্যে সবি পালটে যেতে পারে। শেষে কতোটুকু বাকি থাকে, কী বাকি থাকে? বিশ্বাস করো: ভাষা এক উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত ঘটনা। যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা জুড়িয়ে থাকে গহনে, গভীরে অবসর যাপন করে, সমুদ্রের তলদেশে মুক্তারাশির মতো। কিন্তু তোমাকে আমি আরো কী যেন বলতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ছবির চাই ফ্রেম, পুরুষের চাই দিনের কর্ম। আমি তাই

কিছুদিনের জন্য রাশিয়ার সমুদ্রযাত্রী জাহাজে কাজ নেব। গ্রীকদের সঙ্গে আমার আর বনছে না। দিওতিমা, আমাকে ঘিরে এক অজ্ঞাত অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

দিওতিমা॥ তুমি কি ফিরে আসবে? আমার চারদিকটা বোবা হয়ে আসছে। শূন্যতা ঘিরে ধরছে আমাকেও? তোমাকে আমার অনুভবের নিবিড় ছায়ায় রক্ষা করব কী করে আমি?

স্লাইড ১৭
বিজন হ্রদ

হাইপীরিয়ন॥ মধ্যদিন। প্রৌঢ়কাল। হলুদ ন্যাসপাতি ঝুঁকে রয়,
উন্মত্ত গোলাপ পূর্ণায়ত,
মৃত্তিকা আনত হ্রদের কিনারে,
তবু তোরা লাবণ্য মাখানো হংস যতো
চুম্বনে চুম্বনে আত্মহারা
শিরোদেশ মজায় অনবরত
পবিত্র সলিলে।

কিন্তু ঐ শীত এল বলে,
কী করে আঁজলা ভরে নেব আমি তখন তাহলে
পুষ্পরাশি, রৌদ্রের গরিমা,
ধরণীর ছায়ার প্রতিমা?
তখন দেয়ালগুলি দাঁড়াবে নিঃসাড়
হিমাচ্ছন্ন, বাক্যহত, কেবল বিধ্বস্ত আবহাওয়ার
মোরগ ডাকবে অমঙ্গলে!

কোরাস॥ নিয়তির গান করে হাইপীরিয়ন:
তোমরা আলোয় ঊর্ধ্ব বিহার করো
প্রান্তর রয় নিয়ে নম্র, যতেক ভাগ্যবান।
ঈথার ঝলকে হাওয়া তোমাদের
অঙ্গ জুড়ায় আদরে
যেন কুমারীর অঙ্গুলিতলে
স্বর্গীয় বীণা কাঁপে অণোরণীয়ান।

স্লাইড ১৮
তুষার নিসর্গ

নিয়তিবিহীন দেবতা তোমরা, যেন ঘুমন্ত
মা'র বুকে শিশু, তোমরা সৌর প্রাণ
তেমনি চিন্ময়তার আস্তরণে
অপ্রতিহত পাপড়িতে যেন
প্রস্ফুট করো ক্লান্তিশূন্য
সতেজ মনোবিতান,
দীপ্ত দু-চোখে তাকাও তোমরা
শান্ত চিরন্তন
দৃষ্টিতে অম্লান।

অথচ কেবল আমরা পাইনি
জুড়োবার মতো, হায়, এতোটুকু স্থান,
পতন নিয়তি নিয়ে মুছে যাই,
সন্তাপে জ্বলি, নশ্বর—তাই
প্রহরে প্রহরে অন্ধ
অজ্ঞান ধাবমান
যেমন গড়ায় জল
পাথরে পাথরে অবিবেকী, অবিরাম,
আমরাও ছুটি বছর-বছর জানি না দিবাধাম।

দ্বিতীয় স্বর॥ কে যেন বলেছিলেন, হেরাক্লিটাস না? জল বয়ে যায়, সেই জলে মানুষ দু'বার স্নান করে না। তাঁরই মতো আরেক গ্রীক দার্শনিক, এমপেডোক্লেস, নিয়তিকে ধারণ করেছিলেন। আগুন, বায়ু, জল আর মাটির মিলনবিচ্ছেদ তাঁকে মাতিয়ে দিয়েছিল। প্রেম আর অপ্রেমের ভারসাম্য খুঁজে চলেছিলেন তিনি। স্থাপন করেছিলেন গণতন্ত্রের এক রাজ্য। লোকেরা তাঁকে দেবতার জায়গায় বসিয়েছিল। সেই তিনিই এট্‌নার অগ্নিপর্বতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর সেই 'এমপেডোক্লেসের মৃত্যু'কে নিয়েই নাটক লিখলেন হোল্ডারলীন। এই নাটকে তাঁরই অন্তিম পর্বের পূর্বচ্ছায়া এসে পড়েছে। হোল্ডারলীনই এমপেডোক্লেস।

এমপেডোক্লেস [হোল্ডারলীন]॥

আমার নৈঃশব্দ্যে তুমি এসেছিলে মৃদু সঞ্চরণে,
অন্ধকার থেকে তুমি আমাকে বাহির করে নিলে,
হে বন্ধু। ছিলাম তোমারই প্রত্যাশায়।
আর তোমরাও ওগো আমার কুঞ্জের বৃক্ষদল,
তোমরাও ভাগ্যবান, কখনো করোনি কোনো ভুল!
তোমরা বিনীত হয়ে অমরাবতীর উৎস থেকে
পান করে নিয়েছিলে। আলো আর আয়ুর স্ফুলিঙ্গে
ঈথারে ফোটালে ফুল। আর তুমি নিসর্গ গোপন,
তোমার কাছেই আমি, আমি যে তোমার প্রিয়তম
পুরোহিত, একি তুমি আমাকে চিনতেই পারছো না?
উৎসর্গিত আনন্দিত পশুর রক্তের মতো গান
দিয়েছি তোমাকে সঁপে আজ আমায় চিনতে পারছো না?
পবিত্র ঝর্ণার মূলে, যেখানে মাটির
শিরা উপশিরা থেকে নিজেকে সংগ্রহ করে জল,
জ্বালাময় দিনে
তৃষার্তেরা পান করে সেই জল, পিপাসা মেটায়।
আমার মধ্যেও ছিল জীবনের উৎস, জগতের
নিগূঢ় গোপন থেকে সংগৃহীত, তাই দলে-দলে
তৃষার্ত মানুষ আসত আমার কাছেই। আর আজ?
দুর্ভাগ্য আমাকে ছায়। আমি বুঝি এখন একাকী?
বাইরে যদিও দিন, আমার হৃদয়ে কেন রাত?
হঠাৎ হয়েছি অন্ধ, অন্ধতার সংক্রামণ শুনি,
আমরা দেবতা যতো, তোমরা কোথায়, বলে দাও।
... ...
দুঃসহ এ একাকিত্ব, একা আমি তাই
তোমাদের আর আমি খুঁজে পাইনে, ওগো দেবতারা।
নিসর্গ, আমি তোমার জীবনেও ফিরতে পারি না।
বন্ধু, আমি দিনান্তের পূর্বাভাসে বুঝতে পেরেছি।
অন্ধকার নিথর হয়েছে, আমি শীতার্ত এখন।

বন্ধু, এ জীবন যায় পিছনের দিকে সরে-সরে,
দেয় না ঈষৎ অবকাশ। শিকারের বধির পুলকে
পাখিরা হঠাৎ জাগে সদ্য-ভাঙা ঘুমের শিহরে,
আমার তেমন নয়। কিন্তু এই আতি অর্থহীন!

শিষ্য ॥ প্রভু এমপেডোক্লেস, তুমি আজ আমার কাছেও
কেমন অচেনা যেন হয়ে গেছো? তুমিও কি আমাকে চেনো না?
কী করে তোমার এই রূপান্তর? তুমি
দেবতার বরপুত্র হয়েও এমন
মাটিতে রয়েছো ঝুঁকে যন্ত্রণায়, তুমি আর বরপুত্র নয়?
আমরা তোমার অনুগামী, আর কেউ আমাদের
তোমার মতন করে আনন্দ দেয়নি। ঐ দেখো
কতো যে মানুষ এল, তোমাকে সম্মান দেবে বলে?

এমপেডোক্লেস ॥ আমাকে সম্মান দেবে? যাও তুমি ওদের বলে এসো
অযথা মর্যাদা থেকে যেন ওরা অব্যাহতি দেয়
আমাকে। আমাকে আর মানায় না স্তাবকের স্তুতি
ডাল থেকে ছিঁড়ে নিলে মরে যায় সবুজ পল্লব।

শিষ্য ॥ এখনো দাঁড়িয়ে আছো, সতেজ নদীর
শুশ্রূষা জড়িয়ে আছে তোমার শিকড়ে,
তোমার শিখরদেশে হাওয়া বয়, নশ্বরতা নয়
অন্য এক শক্তি আজো হৃদয়ে তোমার। অমরতা
তোমাকে পরিচর্যা করে।

এমপেডোক্লেস ॥ হায় আমি একা, তবু একদিন আমি কি বাঁচিনি
পবিত্র পৃথিবী আর আলোর সান্নিধ্যে অপরূপ,
ঈথারে দিয়েছে আভা, জীবনের সঙ্গে যে আমিও
বেঁচেছি, দেবতাদের বন্ধুর মতন অলিম্পাসে?
আমাকে নিক্ষেপ করে ফেলে গেছে সবাই, এখন
দারুণ একাকী আমি, যন্ত্রণাই এখন আমার
দিনের বেলার সঙ্গী, শয়নের সঙ্গিনী আমার।
একা হওয়াটাই মৃত্যু, এবং দেবতাদের ছাড়া
বেঁচে থাকাটাই মৃত্যু! [মঞ্চে আলোর বদল]

দ্বিতীয় স্বর ॥ এমপেডোক্লেস ভাবিকথক, তবু তাঁর ভবিষ্যদ্বানীর ভাষা কেড়ে নিয়েছিলেন দেবতারা। আর হোল্ডারলীন, তাঁকেও বন্ধুরা ছেড়ে গেছে। হেগেল, শেলিং তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বানানো আদর্শবাদের স্বাচ্ছন্দ্যে এখন মেতে আছেন। শিলার তাঁকে স্নেহ করতেন, কিন্তু মহাকবি গ্যোয়েটের কাছে হোল্ডারলীন উন্মাদ বলে মনে হওয়ায় তিনিও তাঁকে এড়িয়ে যান। তাঁর অসুখ অসুখ নয়। সংবেদনশীলতাকে যদি অসুখ বলা যায়, তাহলে তিনি অসুস্থ। টুবিঙ্গেনের ক্লিনিকের কোনো ডাক্তারই তাঁর এই ব্যাধি ধরতে পারলেন না বলে তাঁকে বদ্ধ উন্মাদ বলে রায় দিলেন। ১৮০৭ সালে

স্লাইড ১৯
টুবিঙ্গেনে কবির বুরুজবসতি

দরদী এক কাঠের মিস্তিরি, নাম ৎসিমার তাঁকে তাঁর ছোট্ট বুরুজের মতো বাড়িতে নিয়ে এলেন। এখানেই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছত্রিশ বছর তাঁর মৃত্যুময় বাঁচা। তাঁর গৃহকর্তা ৎসিমারের জন্য একটি শ্লোক রচনা করেন হোল্ডারলীন :

স্লাইড ২০
হোল্ডারলীন (৫৫ বছর বয়সে বিধুর)

হোল্ডারলীন ॥ জীবনের রেখাগুলি বিচিত্র যেমন
চলার পথের মতো, পর্বতের শেষাদ্রিসীমানা।
এখানে আমরা চূর্ণ, ঈশ্বরের সৌজন্যে এখানে
পূর্ণতা, তিনিই সব শান্তি দিয়ে করেন পূরণ।

স্লাইড ২১
হোল্ডারলীনের ঘর

কোরাস ॥ হোল্ডারলীন, তুমি এখনো প্রৌঢ়তা অতিক্রম করোনি, তোমার এত বিষাদ কেন? তোমার প্রিয় বাঁশী পিয়ানো আর ম্যাণ্ডোলিন কি তুমি বাজাবে না আর?

স্লাইড ২২
কাঁচঘরে বিশ্বনিসর্গ

হোল্ডারলীন ॥ জগতের মনোরম্য যতো-কিছু করেছি সম্ভোগ,
যৌবনপ্রহরগুলি কবেই হয়েছে অপসৃত,
এপ্রিল, মে-মাস আর জুলাই মিলিয়ে গেছে কবে,
এখন কিছু না আমি, বেঁচে থাকি আকাঙ্খারহিত।

স্লাইড ২৩
ফতোয়া চিত্রিত বসতির প্রাচীর

কোরাস ॥ তোমার বুরুজবসতির দেয়ালে বিপ্লবীরা কড়া রং দিয়ে ফতোয়া দিয়ে গেছে : এই কবি কখনোই পাগল নয়।

একটি চরিত্র ॥ (দর্শকদের দামনে দাঁড়িয়ে। দেখা যাবে, মঞ্চের এককোণে শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন অকালবার্ধক্যে ন্যুব্জ কবি) হতভাগ্য এই মানুষটির বাসস্থানে দেখা করতে গেলে ভুলেও মনে হয় না, এমন কোনো কবির কাছে এসেছি যাঁর সঙ্গে প্লেটোর সহমর্মিতা। বাড়িটা দেখে কিন্তু তা বলে অরুচি জাগে না। বাড়ির মালিক দস্তরমতো সম্পন্ন এক সূত্রধর, যাঁর জ্ঞানের পরিধি প্রত্যাশাতীত, যিনি এমন-কি কাণ্ট, ফিশ্‌টে, শেলিং, নোভালিস, আরো অনেকের বিষয়ে আলোচনা করতে পারঙ্গম। তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করতে হয় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থাগারিকের ঘরটা কোথায়—ঐ অভিধায় সম্বোধিত হতেই কবি পছন্দ করেন। তারপর ছোট্ট একটা দরজার সামনে দাঁড়াই। ভিতর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসে, মনে হতে থাকে, তাঁর সঙ্গে লোকজন দেখা করতে এসেছে বুঝি। নম্র গৃহকর্তা ৎসিমার কিন্তু বলেন : কবি একান্তই একলা আছেন, রাত্রিদিন নিজের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। কীরকম যেন ভাবনা জাগে মনে, দুরুদুরু কেঁপে ওঠে বুক, কেমন যেন ছমছমে লাগতে থাকে। অতঃপর সাহসে ভর করে টোকা দিতেই ভিতর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে উদাত্ত আহ্বান : আসুন! দরজা খুলেই নজরে পড়ে ঘরের মাঝখানে কেন্দ্রস্থ কৃশ-হতে-থাকা মানুষটি, যিনি নিচুর চেয়েও নিচে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানাতে শুরু করে দেন, আর তাঁর সেই আনত মুদ্রার যেন শেষ নেই কোনো—মুদ্রা, নাকি মুদ্রাদোষ?—আর ঐ ভঙ্গিমা সত্যিই তো কতো

লাবণ্যময় মনে হতে পারত, যদি তাকে ছেয়ে কষ্টকর ও ক্লেশজনক আর্তি না থাকত! কী অপূর্বই না ঐ প্রোফাইল, চিন্তাগ্রস্ত ললাটের সমুচ্চতাও কী-আশ্চর্য, মৈত্রীনির্বাণে স্তিমিত চোখ দুটিতে এখনো সত্তা ও প্রেম জাগ্রত হয়ে আছে। গালে আর মুখে, নাকে আর চোখে এক অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ, আর শোচনা-জাগানো কম্পন ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ছড়িয়ে যায় কাঁধে, তারপর দেখি হাতের আঙুলগুলোও থরথর করে কাঁপছে।

আরেকটি চরিত্র ॥ আশ্রয়দাতা ৎসিমারের স্ত্রী কিংবা তাঁর ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে কেউ-না-কেউ প্রায়ই বেচারা কবিকে নিয়ে জমিজমা আর দ্রাক্ষাকুঞ্জে বেড়াতে যেতেন। কবি বসে রইতেন একটা পাথরের ওপর নিশ্চুপ, যতোক্ষণ না বাড়িতে ফেরার সময় হয়। তাঁকে খেপিয়ে না তুলতে হলে তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করতে হতো যেন তিনি নিতান্তই শিশু। কোথাও বেরোবার সময় তাঁকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হয় হাতদুটো ধুয়ে ফেলতে হবে, কেননা গোটা দিনের অর্ধেকটা জুড়েই তাঁর অভ্যেস ছিল রাজ্যির ঘাস ছিঁড়তে থাকা। সাজসজ্জা হয়ে গেলেও বেরিয়ে পড়া কিংবা সবার সামনে-সামনে চলা তাঁর ধাতে নেই। চোখ-ঢাকা টুপিখানা ওঁর মুখ গ্রাস না করে ফেললে এমন-কি রাস্তার দু-বছর বয়সের একটি শিশুর কাছেও বিনতি জানিয়ে টুপি নামান। তবে শহরের মানুষজন বিষয়ে একটা প্রশংসা না করে পারছি না যে যাঁরাই তাঁকে চেনেন কেউই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করেন না, তাঁকে রাস্তা পার হয়ে যেতে দেন। সবাই এই একটা কথাই বলেন : আহারে, এই মানুষটি কী রকম বিচক্ষণ আর মহাপণ্ডিত ছিলেন একদিন, আর আজ কিনা তাঁর মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে! একলা তাঁকে কোথাও ছেড়ে দেবার জো নেই, বড়ো জোর বাড়ির সামনের উদ্যানে তাঁকে কখনো কখনো একা ছেড়ে দেওয়া হয়।

লোটে (ৎসিমারের মেয়ে) ॥ বাবাকে বাদ দিলে একমাত্র আমার পরিচর্যাই গ্রহণ করেন তিনি। বাড়িতে যখন ফেরেন, অবিশ্রান্ত পদচারণা শুরু হয়ে যায় তাঁর। ঘরেই খাবার নিয়ে রেখে আসা হয়। বুঝতেই পারা যায় প্রবল খিদে পেয়েছে তাঁর, দারুণ তৃপ্তি নিয়ে তিনি খেতে থাকেন। ওয়াইন পান করেনও অনিঃশেষ, যতোক্ষণ তাঁকে পরিবেশন করা হচ্ছে বারণ আর তিনি করেন না। খাওয়া শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু

বাসন-কোশন ঘরের মধ্যে সইতে পারেন না একেবারেই। নিজেই গিয়ে চৌকাঠের বাইরে থালাবাটিগুলো রেখে আসেন। তাঁর যা চূড়ান্ত নিজস্ব তা ছাড়া আর সব-কিছুই তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে রেখে এসে তবেই তাঁর স্বস্তি। দিনের বাকিটা অংশ আবার তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা আর ঘরের মধ্যে অস্থির পায়চারি।

অন্য চরিত্র ॥ যদি কোনো-একটা জিনিস নিয়েই দিনভর মেতে উঠতে পারেন তো তা হল তাঁর নিজের বই : হাইপীরিয়ন। তাঁর কাছে গিয়ে অন্তত একশোবার ভরাট গলায় এর আবৃত্তি শুনেছি। বইটা প্রায় সব সময়েই তাঁর কাছে খোলা থাকে, আর আবৃত্তির সময় কেমন যেন একটি বিষাদগুণ ছাপিয়ে ওঠে। কতোবার যে আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। এক-একটা অংশ পড়বার পর আবার শুরু করেন, লীলাময় অনুভাব প্রকাশ পায় তখন তাঁর হাবভাবে, এক-এক সময় তিনি চীৎকার করে ওঠেন : 'সুন্দর! রাজন্!' অতঃপর আবার পাঠ, কখনো-বা বলে ওঠেন : 'সদয় ভদ্রমহোদয়, দেখুন, এখানে একটা কমা ব্যবহার করেছি।' অন্যান্য যে বই তাঁর হাতে পড়ত, পড়ে শোনাতেন। কিন্তু যা পড়ছেন এক বর্ণও যে বুঝতে পারছেন তা আমার মনে হয়নি, তাঁর চিন্তাধারাই যে অসংলগ্ন হয়ে গিয়েছে, বুঝবেন কী করে। অথচ সমস্ত বইপত্রেই সীমাহীন প্রশংসা করা ছিল তাঁর স্বভাব।

ৎসিমারের মেয়ে ॥ মাঝে-মাঝে কবি একলা ঘরে পিয়ানো বাজান, নিজেকেই যেন শোনাচ্ছেন, এই ধরনে। হোল্ডারলীন নিজেই জানলাটা খুলে দিয়ে পাশে বসে রইলেন। আর তারপর, অত্যন্ত স্বচ্ছ, সংলগ্ন ভাষায়, বাইরের দৃশ্যের প্রশংসা শুরু করে দিলেন। এটা আমার চোখে পড়েছে, বাহির নিসর্গেই তিনি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ বোধ করেন। তখন নিজের সঙ্গে কথা বলাটাও কমে যায়, স্পষ্টভাষায় কথা বলতে পারেন, সেটাই আমার অনুমানের স্বপক্ষে একটা প্রমাণ : আসলে আমি এই মর্মে নিশ্চিত যে ঐ নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা আসলে স্বকীয় চিন্তার ভীরু অনিশ্চয়তা থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা-কিছু বিষয়কে শক্ত করে ধরবার চেষ্টা ছাড়া আর-কিছু নয়। তারপর আমি কী করলাম, তাঁকে নস্যি আর তামাক জোগালাম। আর তখন তাঁর কী আনন্দ! একটিপ নস্যি নিয়েই তিনি বেশ সতেজ হয়ে উঠলেন। পাইপে তামাক পুরে ধরিয়ে তাঁকে দিতেই

তিনি তামাক আর পাইপের উচ্ছল প্রশংসা করতে লাগলেন। এক সময় তাঁর কথা বলায় ছেদ পড়ল। দেখলাম বেশ ভালোই বোধ করছেন কবি, তাঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। আমি কোনো-একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকলাম।

ঐ যাকে তোমরা পাগল বলো, তিনি যেভাবে আমাদের বাগানবাড়ির জানলার ধারে বসে আছেন, তিনি আমার কাছে অনেক তাৎপর্যময়, আমার অনেক কাছে হাজারে হাজারে যতো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ রয়েছে তাঁদের সবার চেয়েও। যদি একবার তাঁর ঐ রুগ্ন কম্পমান ওষ্ঠাধর আমি চুম্বন করতে পারতাম।

[বাইরের দরজায় শব্দ। অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়েন কার্ল মার্কস]

ওঃ, কী কাণ্ড বলতে ভুলে গেছি
লাইব্রেরিয়ান, হোল্ডারলীন,
আপনাকে দেখতে এসেছেন একজন আগন্তুক

[হোল্ডারলীন অপ্রস্তুত, কুঁকড়ে যেন লুকিয়ে পড়তে চান]

একি, আপনি কী করছেন। এই তরুণটির নাম কার্ল মার্কস
আপনার ভীষণ ভক্ত। নিজেও লেখেন
কবিতা, তাছাড়া নিজে 'রাইন পত্রিকা'র সম্পাদক।

হোল্ডারলীন ॥ রাজন্, সন্দেহ করি
আমার বেঁচে-থাকার বিষয়ে দু-চার কথা আপনি
শুনে থাকবেন। আমি আমার আমিত্ব নিয়ে আর
অস্তিত্বহীনতা নিয়ে আপনাকে সম্ভাষণ করি—
এ ছাড়া কী বলব আর, কী করে যে বলব জানি না।

মার্কস ॥ [ৎসিমারের মেয়ের দিকে তাকিয়ে] উনি 'লাইব্রেরিয়ান' বলে সম্বোধন করলেই খুশি হন। তাই না?

[ৎসিমারের মেয়ে নীরবে সম্মতিসূচক স্মিত তাকান]

মার্কস ॥ গ্রন্থাগারিক, শুনেছি আপনি
তামাক ভালোবাসেন। বিলিতি হলেও
এই তামাকটা ভালো, আপনার জন্যেই এনেছি।

[হোল্ডারলীন নেন না। লোটেই সেটা তাঁর হয়ে গ্রহণ করেন]

মার্কস ॥ আপনার হাইপীরিয়ন পড়ার কী ফল হয়েছিল
শুনবেন ? সঙ্গে-সঙ্গেই
আমার কবিতা লিখবার
ক্ষমতা বিচূর্ণ হল। তারপরে অন্য পথ ধরি!
সমস্ত দেবায়তন জীর্ণ আজ, এখন সেখানে
নতুন দেবতাদের প্রবেশাধিকার দিতে হবে।
[হোল্ডারলীন উৎসুক হয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ান]

হোল্ডারলীন ॥ যখন পুরুষ এক আয়নায় নিজেকে চেয়ে দেখে
দেখে নিজপ্রতিকৃতি, চিত্রার্পিত। তার সঙ্গে সেই পুরুষের
সাদৃশ্য রয়েছে। চোখ দুটো পুরুষেরই, তবু
চাঁদের কিরণে জ্বলে। রাজা ঈদিপাসের হয়তো
আরো একটি অতিরিক্ত চক্ষু ছিল তার যন্ত্রণার
প্রকাশ অবর্ণণীয়, ভাষার অতীত। নাটকের
দর্পণে দেখেছো তুমি সেই শোক। আমারও নিয়তি
সেরকম, নদী যেন বয়ে যেতে গিয়ে
আমার ভিতর থেকে কিছু নিয়ে যায়, তারপরে
এশিয়ার দিকে যায়। এখন আমার কাছে তাই
জীবন মরণ, আর মৃত্যু সে-ও আরেক জীবন।

মার্কস ॥ দেবতারা যদি
কোনোদিন পৃথিবীতে বাস করতেন
তাহলে এখন তাঁরা
থাকতেন বিশ্বের কেন্দ্রে। কিন্তু কোনো অমরতা নয়,
অন্তহীনতার জায়গায়
নশ্বরতা এসে গেছে। আপনার লেখায় সে সবি
ফুটেছে গভীরভাবে, সেই সঙ্গে সমগ্র একটি যুগ।
আপনি যে পৌরাণিক রূপকের সাহায্যে সে-কথা
বলেছেন, সেটা কোনো অপরাধ নয়। রূপান্তরের
দুটো পথ খোলা আছে, এক হলো ঐতিহাসিক
পরিস্থিতির স্বচ্ছ বিশ্লেষণ, এবং অন্যটি
নিজস্ব অনুভূতির পৌরাণিক রূপান্তর

হোল্ডারলীন ॥ সমস্ত ভালো জিনিস বলতে তিনটিই—
প্রথমত, ঈশ্বরের বিগ্রহ বা ছবি
বিচূর্ণ না করা।
দ্বিতীয়ত, মঙ্গলপ্রসাদ
আমৃত্যু গ্রহণ করা। তৃতীয়ত ঈশ্বরের দেওয়া
জীবনের আলোকে সম্মান করা সমস্ত জীবন।

মার্কস ॥ সশস্ত্র বিপ্লব নিয়ে আপনার লেখা
'এমপেডোক্লেসের মৃত্যু' নাটকটা আমি
কিনতে গিয়েছিলাম, প্রকাশক জানালেন বাজারে
তার কোনো কপি নেই আর।

স্লাইড ২৪
ভারতবর্ষকে নিয়ে কবির কবিতার
অংশ যা এখনো কবির কক্ষে প্রদর্শিত

হোল্ডারলীন ॥ আমাকে ওসব আর বলো কেন ? আমার কী মনে হয় জান ?
এখনই তো ভারতবর্ষের দিকে
চলে গেল পুরুষেরা, সেইখানে পর্বতশিখরে
দ্রাক্ষাকুঞ্জ আছে, আর সেখান থেকেই
নেমে আসে শক্তিশালী নদী
আরেক নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমুদ্রের দিকে
স্রোত বহে যায়। স্মৃতি আর ভালোবাসা নিয়ে
আদান-প্রদান করে সমুদ্র। শুধু
যা-কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, প্রতিষ্ঠিত করেন কবিরা।

লোটে ॥ (মার্কসের দিকে তাকিয়ে)
উনি এখন ক্লান্ত, ওর ঘুমোতে যাবার
সময় হয়েছে। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।
[মার্কস, লোটের প্রস্থান। হোল্ডারলীন ঘুমিয়ে পড়েছেন।
একটি চরিত্রের প্রবেশ। সে কবির কপালে হাত রেখে দর্শকদের
দিকে এগিয়ে যায়। তার মুখ দেখেই বোঝা যায়, কবির
মৃত্যু ঘটেছে।]

স্লাইড ২৫

মৃত্যুদীর্ণ মানুষের মুখ

কোরাস ॥ [তার মধ্য চরিত্রটি] পবিত্রতম ঝড়ের আশীর্বাদে
ভাঙুক আমার কারাপ্রাচীর শেষে,
সত্তা আমার তীর্থযাত্রী আজ,
যাক সে এবার অজ্ঞাত সেই দেশে।

সমাপ্তি

নিয়তি ও দেবযান

অনুবাদ গ্রন্থনা পরিকল্পনা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আবহ : হান্‌স্ য়্যুর্গেন নাগেল

আলো : চিত্ত সরকার

স্লাইড নির্বাচন : ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত

ফিল্মভায় 'আপন দেশ' ('ডি হাইমাট')

নির্মাণ : দুর্গাশঙ্কর ঘোষ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাজসজ্জা : দ্য নিউ স্টুডিও সাপ্লাই

নির্দেশনা : সুনীল দাশ

অভিনয়ে

তরুণ হোল্ডারলীন : শুভাশিস পাল

হোল্ডারলীন : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায় : অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায় রাজা মুখোপাধ্যায় সঞ্জয় ঘোষ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সৈকত সেনগুপ্ত শান্তনু লাহিড়ী শুভাশিস মুখোপাধ্যায় চিত্রলেখা বসু উইলিয়াম ঈশিতা মিত্র

Let the buds of your hopes Aspirations
Blossom under the surest protection of peerless

With Best Compliments of

*

The Peerless General Finance & Investment Company Limited

ESTD : 1932

Regd. & Head Office :

PEERLESS BHAVAN, 3 ESPLANADE EAST
CALCUTTA-700 069

TOTAL ASSETS OVER Rs. 500 CRORES
INDIA'S LARGEST NON-BANKING
SAVINGS COMPANY

BIVAV
April 85
Price : Rs. 5.00
Vol. 8 No. 2
Regd. No.
R. N. 30017/76